বাংলাসাহিত্যের নির্বাচিত বড়গল্প

প্রথম খণ্ড

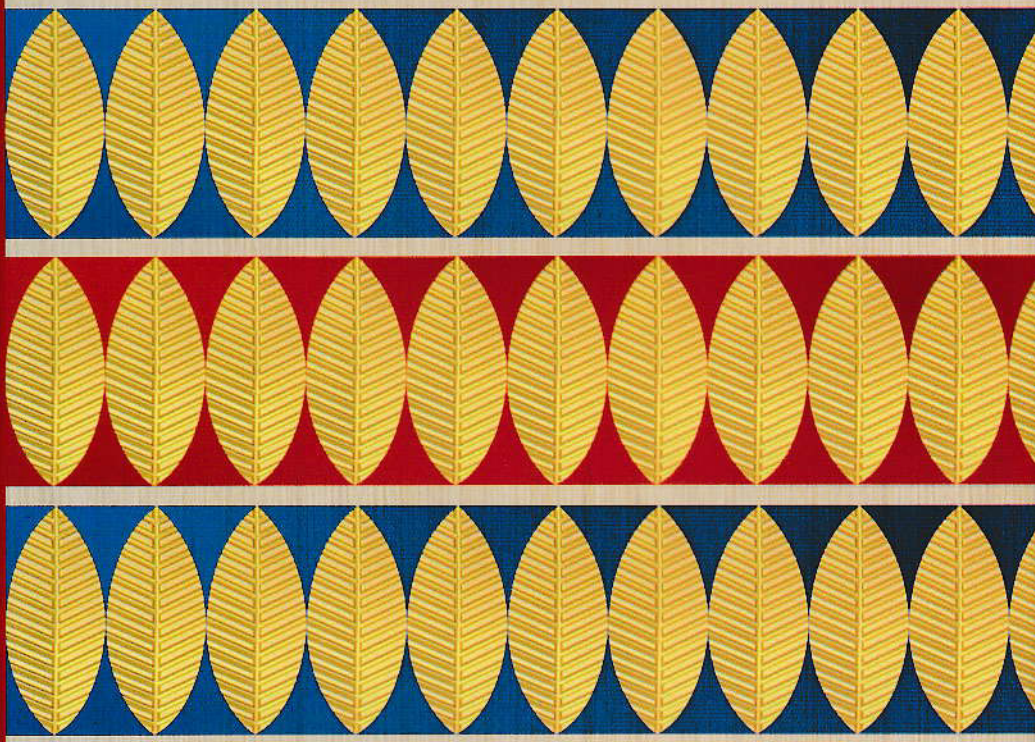

বাংলাসাহিত্যের নির্বাচিত বড়গল্প

(প্রথম খণ্ড)

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৭

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
আষাঢ় ১৩৯৬ জুলাই ১৯৮৯

পঞ্চম সংস্করণ পঞ্চম মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪২২ ডিসেম্বর ২০১৫

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪, মোবা. ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

মুদ্রণ
ওমাসিস
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0016-X

BANGLASHAHITTER NIRBACHITO BOROGALPO [Vol. 1]
Selected novellas of Bengali literature
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Price : Tk. 100.00 only

www.bsksale.com

বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বড়গল্পগুলোকে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের পাঠকসাধারণের হাতে তুলে দেবার উদ্দেশ্যে 'বাংলাসাহিত্যের নির্বাচিত বড়গল্প' শিরোনামে একটি সঙ্কলন আমরা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। এই সঙ্কলনের প্রথম খণ্ডে যেসব লেখকের গল্প সঙ্কলিত হয়েছে তাঁরা হলেন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোজ বসু, সৈয়দ শামসুল হক।

সূচি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ল্যাবরেটরি	৯
মনোজ বসু ॥ রায়রায়ানের দেউল	৪৩
সৈয়দ শামসুল হক ॥ রক্তগোলাপ	৫৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ল্যাবরেটরি

নন্দকিশোর ছিলেন লন্ডন য়ুনিভার্সিটি থেকে পাস-করা এঞ্জিনিয়ার। যাকে সাধুভাষায় বলা যেতে পারে দেদীপ্যমান ছাত্র অর্থাৎ ব্রিলিয়ান্ট, তিনি ছিলেন তাই। স্কুল থেকে আরম্ভ করে শেষপর্যন্ত পরীক্ষার তোরণে তোরণে ছিলেন পয়লা শ্রেণির সওয়ারি।

ওঁর বুদ্ধি ছিল ফলাও, ওঁর প্রয়োজন ছিল দরাজ, কিন্তু ওঁর অর্থসম্বল ছিল আঁটমাপের।

রেলওয়ে কোম্পানির দুটো বড় ব্রিজ তৈরি করার কাজের মধ্যে উনি ঢুকে পড়তে পেরেছিলেন। ও-কাজের আয়ব্যয়ের বাড়তি-পড়তি বিস্তর, কিন্তু দৃষ্টান্তটা সাধু নয়। এই ব্যাপারে যখন তিনি ডানহাত বাঁহাত দুই হাতই জোরের সঙ্গে চালনা করেছিলেন তখন তাঁর মন খুঁতখুঁত করেনি। এসব কাজের দেনাপাওনা নাকি কোম্পানি-নামক একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট সত্তার সঙ্গে জড়িত, সেইজন্যে কোনও ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের তহবিলে এর পীড়া পৌঁছয় না।

ওঁর নিজের কাজে কর্তারা ওঁকে জিনিয়স বলত, নিখুঁত হিসাবের মাথা ছিল তাঁর। বাঙালি বলেই তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক তাঁর জোটেনি। নিচের দরের বিলিতি কর্মচারী প্যান্টের দুই ভরা-পকেটে হাত গুঁজে যখন পা ফাঁক করে 'হ্যালো মিস্টার মল্লিক' বলে ওঁর পিঠথাবড়া দিয়ে কর্তাত্বি করত তখন ওঁর ভালো লাগত না। বিশেষত যখন কাজের বেলা ছিলেন উনি, আর দামের বেলা আর নামের বেলা ওরা। এর ফল হয়েছিল এই যে, নিজের ন্যায্য প্রাপ্য টাকার একটা প্রাইভেট হিসেব ওঁর মনের মধ্যে ছিল, সেটা পুষিয়ে নেবার ফন্দি জানতেন ভালো করেই।

পাওনা এবং অপাওনার টাকা নিয়ে নন্দকিশোর কোনোদিন বাবুগিরি করেননি। থাকতেন শিকদারপাড়া গলির একটা দেড়তলা বাড়িতে। কারখানাঘরের দাগ-দেওয়া কাপড় বদলাবার ওঁর সময় ছিল না। কেউ ঠাট্টা করলে বলতেন, 'মজুর মহারাজের তকমা-পরা আমার এই সাজ।'

কিন্তু বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্যে বিশেষ করে তিনি বাড়ি বানিয়েছিলেন খুব মস্ত। এমন মশগুল ছিলেন নিজের শখ নিয়ে যে, কানে উঠত না লোকেরা বলাবলি করছে, এতবড় ইমারতটা যে আকাশ ফুঁড়ে উঠল— আলাদিনের প্রদীপটা ছিল কোথায়।

এক রকমের শখ মানুষকে পেয়ে বসে সেটা মাতলামির মতো, হুঁশ থাকে না যে লোকে সন্দেহ করছে। লোকটা ছিল সৃষ্টিছাড়া, ওঁর ছিল বিজ্ঞানের পাগলামি। ক্যাটালগের তালিকা ওলটাতে ওলটাতে ওঁর সমস্ত মনপ্রাণ চৌকির দুই হাতা আঁকড়ে ধরে উঠত ঝেঁকে ঝেঁকে। জর্মনি থেকে আমেরিকা থেকে এমন সব দামি দামি যন্ত্র আনাতেন যা ভারতবর্ষের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে মেলে না। এই বিদ্যালোভীর মনে সেই তো ছিল বেদনা। এই পোড়াদেশে

জ্ঞানের ভোজের উচ্ছিষ্ট নিয়ে শস্তাদরের পাতা পাড়া হয়। ওদের দেশে বড় বড় যন্ত্র ব্যবহারের যে সুযোগ আছে আমাদের দেশে না-থাকাতেই ছেলেরা টেক্সটবুকের শুকনো পাতা থেকে কেবল এঁটোকাঁটা হাতড়িয়ে বেড়ায়। উনি হেঁকে উঠে বলতেন, ক্ষমতা আছে আমাদের মগজে, অক্ষমতা আমাদের পকেটে। ছেলেদের জন্যে বিজ্ঞানের বড় রাস্তাটা খুলে দিতে হবে বেশ চওড়া করে, এই হল ওঁর পণ।

দুর্মূল্য যন্ত্র যত সংগ্রহ হতে লাগল, ওঁর সহকর্মীদের ধর্মবোধ ততই অসহ্য হয়ে উঠল। এই সময়ে ওঁকে বিপদের মুখ থেকে বাঁচালেন বড়সাহেব। নন্দকিশোরের দক্ষতার উপর তাঁর প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল। তা ছাড়া রেলওয়ের কাজে মোটা মোটা মুঠোর অপসারণদক্ষতার দৃষ্টান্ত তাঁর জানা ছিল।

চাকরি ছাড়তে হল। সাহেবের আনুকূল্যে রেল-কোম্পানির পুরোনো লোহালক্কড় শস্তা দামে কিনে নিয়ে কারখানা ফেঁদে বসলেন। তখন য়ুরোপের প্রথম যুদ্ধের বাজার সরগরম। লোকটা অসামান্য কৌশলী, সেই বাজারে নতুন নতুন খালে-নালায় তাঁর মুনাফার টাকায় বান ডেকে এল।

এমন সময় আর-একটা শখ পেয়ে বসল ওঁকে।

একসময়ে নন্দকিশোর পাঞ্জাবে ছিলেন তাঁর ব্যবসার তাগিদে। সেখানে জুটে গেল তাঁর এক সঙ্গিনী। সকালে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন, বিশ বছরের মেয়েটি ঘাগরা দুলিয়ে অসংকোচে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত— জ্বলজ্বলে তার চোখ— ঠোঁটে একটি হাসি আছে, যেন শান-দেওয়া ছুরির মতো। সে ওঁর পায়ের কাছে ঘেঁষে এসে বললে, "বাবুজি, আমি কয়দিন ধরে এখানে এসে দুবেলা তোমাকে দেখছি। আমার তাজ্জব লেগে গেছে।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "কেন, এখানে তোমাদের চিড়িয়াখানা নেই নাকি?"

সে বললে, "চিড়িয়াখানার কোনও দরকার নেই। যাদের ভিতরে রাখবার, তারা বাইরে সব ছাড়া আছে। আমি তাই মানুষ খুঁজছি।"

"খুঁজে পেলে?"

নন্দকিশোরকে দেখিয়ে বললে, "এই তো পেয়েছি।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "কী গুণ দেখলে বলো দেখি।"

ও বলল, "এখানকার বড় বড় সব শেঠজি, গলায় মোটা সোনার চেন, হাতে হীরার আংটি, তোমাকে ঘিরে এসেছিল— ভেবেছিল বিদেশী বাঙালি কারবার বোঝে না। শিকার জুটেছে ভালো। কিন্তু দেখলুম তাদের একজনেরও ফন্দি খাটল না। উলটে ওরা তোমারই ফাঁসকলে পড়েছে। কিন্তু তা ওরা এখনও বোঝেনি, আমি বুঝে নিয়েছি।"

নন্দকিশোর চমকে গেল কথা শুনে। বুঝলে একটি চিজ বটে— সহজ নয়।

মেয়েটি বললে, "আমার কথা তোমাকে বলি, তুমি শুনে রাখো। আমাদের পাড়ায় একজন ডাকসাইটে জ্যোতিষী আছে। সে আমার কুষ্টি গণনা করে বলেছিল, একদিন দুনিয়ায় আমার নাম জাহির হবে। বলেছিল আমার জন্মস্থানে শয়তানের দৃষ্টি আছে।"

নন্দকিশোর বললে, "বলো কী! শয়তানের?"

মেয়েটি বললে, "জানো তো বাবুজি, জগতে সবচেয়ে বড় নাম হচ্ছে ওই শয়তানের। তাকে যে নিন্দে করে করুক, কিন্তু সে খুব খাঁটি। আমাদের বাবা বোম্‌ভোলানাথ ভোঁ হয়ে থাকেন। তাঁর কর্ম নয় সংসার চালানো। দেখো-না, সরকার বাহাদুর শয়তানির জোরে দুনিয়া

জিতে নিয়েছে, খৃস্টানির জোরে নয়। কিন্তু ওরা খাঁটি, তাই রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছে। যেদিন কথার খেলাপ করবে, সেদিন ওই শয়তানেরই কাছে কানমলা খেয়ে মরবে।"

নন্দকিশোর আশ্চর্য হয়ে গেল।

মেয়েটি বললে, "বাবু, রাগ কোরো না। তোমার মধ্যে ওই শয়তানের মন্তর আছে। তাই তোমারই হবে জিত। অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তা হলে তুমি ঠকবে।"

নন্দকিশোর হেসে বললে, "কী করতে হবে?"

"দেনার দায়ে আমার আইমার বাড়িঘর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, তোমাকে সেই দেনা শোধ করে দিতে হবে।"

"কত টাকা দেনা তোমার।"

"সাত হাজার টাকা।"

নন্দকিশোরের চমক লাগল, ওর দাবির সাহস দেখে। বললে, "আচ্ছা, আমি দিয়ে দেব, কিন্তু তার পরে?"

"তার পরে আমি তোমার সঙ্গ কখনও ছাড়ব না।"

"কী করবে তুমি।"

"দেখব, যেন কেউ তোমায় ঠকাতে না পারে আমি ছাড়া।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "আচ্ছা বেশ, রইল কথা, এই পরো আমার আংটি।"

কষ্টিপাথর আছে ওঁর মনে, তার উপরে দাগ পড়ল, একটা দামি ধাতুর। দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝকঝক করছে ক্যারেক্টরের তেজ— বোঝা গেল ও নিজের দাম নিজে জানে, তাতে একটুমাত্র সংশয় নেই।

নন্দকিশোর অনায়াসে বললে 'দেব টাকা'— দিলে সাত হাজার বুড়ি আইমাকে।

মেয়েটিকে ডাকত সবাই সোহিনী বলে। পশ্চিমি ছাঁদের সুকঠোর এবং সুন্দর তার চেহারা। কিন্তু চেহারায় মন টলাবে, নন্দকিশোর সে জাতের লোক ছিলেন না। যৌবনের হাটে মন নিয়ে জুয়ো খেলবার সময়ই ছিল না তাঁর।

নন্দকিশোর ওকে যে-দশা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা খুব নির্মল নয়, এবং নিভৃত নয়। কিন্তু ওই একরোখা একগুঁয়ে মানুষ সাংসারিক প্রয়োজন বা প্রথাগত বিচারকে গ্রাহ্য করতেন না। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করত, 'বিয়ে করেছ কি।' উত্তরে শুনত, বিয়েটা খুব বেশি মাত্রায় নয়, সহ্যমতো। লোকে হাসত যখন দেখত, উনি স্ত্রীকে নিজের বিদ্যের ছাঁচে গড়ে তুলতে উঠেপড়ে লেগে গিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করত, "ও কি প্রোফেসারি করতে যাবে নাকি।"

নন্দ বলতেন, "না, ওকে নন্দকিশোরি করতে হবে, সেটা যে-সে মেয়ের কাজ নয়।"

বলত, "আমি অসবর্ণবিবাহ পছন্দ করি নে।"

"সে কী হে।"

"স্বামী হবে এঞ্জিনিয়ার আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনি, এটা মানবধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়াবাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।"

২

নন্দকিশোর মারা গেলেন প্রৌঢ় বয়সে কোন্-এক দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে।

সোহিনী সমস্ত কারবার বন্ধ করে দিলে। বিধবা মেয়েদের ঠকিয়ে খাবার ব্যবসাদার এসে পড়ল চারদিক থেকে। মামলার ফাঁদ ফাঁদলে আত্মীয়তার ছিটেফোঁটা আছে যাদের। সোহিনী স্বয়ং সমস্ত আইনের প্যাঁচ নিতে লাগল বুঝে। তার উপরে নারীর মোহজাল বিস্তার করে দিলে স্থান বুঝে উকিলপাড়ায়। সেটাতে তার অসংকোচ নৈপুণ্য ছিল, সংস্কার মানার কোনও বালাই ছিল না। মামলায় জিতে নিলে একে একে, দূর সম্পর্কের দেওর গেল জেলে দলিল জাল করার অপরাধে।

ওদের একটি মেয়ে আছে, তার নামকরণ হয়েছিল নীলিমা। মেয়ে স্বয়ং সেটিকে বদল করে নিয়েছে— নীলা। কেউ না মনে করে, বাপ-মা মেয়ের কালো রঙ দেখে একটা মোলায়েম নামের তলায় সেই নিন্দেটি চাপা দিয়েছে। মেয়েটি একেবারে ফুটফুটে গৌরবর্ণ। মা বলত, ওদের পূর্বপুরুষ কাশ্মীর থেকে এসেছিল— মেয়ের দেহে ফুটেছে কাশ্মীরী শ্বেতপদ্মের আভা, চোখেতে নীলপদ্মের আভাস, আর চুলে চমক দেয় যাকে বলে পিঙ্গলবর্ণ।

মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে কুলশীল জাতগুষ্টির কথা বিচার করবার রাস্তা ছিল না। একমাত্র ছিল মন ভোলাবার পথ, শাস্ত্রকে ডিঙিয়ে গেল তার ভেলকি। অল্প বয়সের মাড়োয়ারি ছেলে, তার টাকা পৈতৃক, শিক্ষা একালের। অকস্মাৎ সে পড়ল এসে অনঙ্গের অলক্ষ্য ফাঁদে। নীলা একদিন গাড়ির অপেক্ষায় ইস্কুলের দরজার কাছে ছিল দাঁড়িয়ে। সেই সময় ছেলেটি দৈবাৎ তাকে দেখেছিল। তার পর থেকে আরও কিছুদিন ওই রাস্তায় সে বায়ুসেবন করেছে। স্বাভাবিক স্ত্রীবুদ্ধির প্রেরণায় মেয়েটি গাড়ি আসবার বেশ কিছুক্ষণ পূর্বেই গেটের কাছে দাঁড়াত। কেবল সেই মাড়োয়ারি ছেলে নয়, আরও দু চার সম্প্রদায়ের যুবক ঐখানটায় অকারণ পদচারণার চর্চা করত। তার মধ্যে ওই ছেলেটিই চোখ বুজে দিল ঝাঁপ ওর জালের মধ্যে। আর ফিরল না। সিভিল মতে বিয়ে করলে সমাজের ওপারে। বেশিদিনের মেয়াদে নয়। তার ভাগ্যে বধূটি এল প্রথমে, তার পরে দাম্পত্যের মাঝখানটাতে দাঁড়ি টানলে টাইফয়েড, তার পরে মুক্তি।

সৃষ্টিতে অনাসৃষ্টিতে মিশিয়ে উপদ্রব চলতে লাগল। মা দেখতে পায় তার মেয়ের ছটফটানি। মনে পড়ে নিজের প্রথম বয়সের জ্বালামুখীর অগ্নিচাঞ্চল্য। মন উদ্‌বিগ্ন হয়। খুব নিবিড় করে পড়াশোনার বেড়া ফাঁদতে থাকে। পুরুষ শিক্ষক রাখল না। একজন বিদুষীকে লাগিয়ে দিল ওর শিক্ষকতায়। নীলার যৌবনের আঁচ লাগত তারও মনে, তুলত তাকে তাতিয়ে অনির্দেশ্য কামনার তপ্তবাষ্পে। মুগ্ধের দল ভিড় করে আসতে লাগল এ দিকে, ও দিকে। কিন্তু দরওয়াজা বন্ধ। বন্ধুত্বপ্রয়াসিনীরা নিমন্ত্রণ করে চায়ে টেনিসে সিনেমায়, নিমন্ত্রণ পৌঁছয় না কোনও ঠিকানায়। অনেক লোভী ফিরতে লাগল মধুগন্ধভরা আকাশে, কিন্তু কোনও অভাগ্য কাঙাল সোহিনীর ছাড়পত্র পায় না। এদিকে দেখা যায় উৎকণ্ঠিত মেয়ে সুযোগ পেলে উঁকিঝুঁকি দিতে চায় অজায়গায়। বই পড়ে যে-বই টেক্সটবুক কমিটির অনুমোদিত নয়, ছবি গোপনে আনিয়ে নেয় যা আর্ট-শিক্ষার আনুকূল্য করে বলে বিড়ম্বিত। ওর বিদুষী শিক্ষয়িত্রীকে পর্যন্ত অন্যমনস্ক করে দিলে। ডায়োসিশন থেকে বাড়ি ফেরবার পথে আলুথালু-চুলওয়ালা গোঁফের-রেখামাত্র-দেওয়া সুন্দর-হানো এক ছেলে ওর গাড়িতে

চিঠি ফেলে দিয়েছিল। ওর রক্ত উঠেছিল ছমছম করে। চিঠিখানা লুকিয়ে রেখেছিল জামার মধ্যে। ধরা পড়ল মায়ের কাছে। সমস্ত দিন ঘরে বন্ধ থেকে কাটল অনাহারে।

সোহিনীর স্বামী যাদের বৃত্তি দিয়েছিলেন, সেইসব ভালো ভালো ছাত্রমহলে সোহিনী পাত্র সন্ধান করেছে। সবাই প্রায় আড়ে আড়ে ওর টাকার থলির দিকে তাকায়। একজন তো তার থিসিস ওর নামে উৎসর্গ করে বসল। ও বললে, "হায় রে কপাল, লজ্জায় ফেললে আমাকে। তোমার পোস্ট গ্রাজুয়েটি মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে শুনলুম, অথচ মালাচন্দন দিলে অজায়গায়— হিসাব করে ভক্তি না করলে উন্নতি হবে না যে।"

কিছুদিন থেকে একটি ছেলের দিকে সোহিনী দৃষ্টিপাত করছিল। ছেলেটি পছন্দসই বটে। তার নাম রেবতী ভট্টাচার্য। এরই মধ্যে সায়ান্সের ডাক্তার পদবিতে চড়ে বসেছে। ওর দুটো-একটা লেখার যাচাই হয়ে গেছে বিদেশে।

৩

লোকের সঙ্গে মেলামেশা করবার কলাকৌশল সোহিনীর ভালো করেই জানা আছে। মন্মথ চৌধুরী রেবতীর প্রথম দিককার অধ্যাপক। তাঁকে নিলে বশ করে। কিছুদিন চায়ের সঙ্গে বুটিটোস্ট, অমলেট, কখনও-বা ইলিশমাছের ডিমের বড়া খাইয়ে কথাটা পাড়লে। বললে, "আপনি হয়তো ভাবছেন আমি আপনাকে বারে বারে চা খেতে ডাকি কেন।"

"মিসেস মল্লিক, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলতে পারি— সেটা আমার দুর্ভাবনার বিষয় নয়।"

সোহিনী বললে, "লোকে ভাবে আমরা বন্ধুত্ব করে থাকি স্বার্থের গরজে।"

"দেখো মিসেস মল্লিক, আমার মত হচ্ছে এই— গরজটা যারই হোক, বন্ধুত্বটাই তো লাভ। আর এই বা কম কথা কী, আমার মতো অধ্যাপককে দিয়েও কারও স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে। এ জাতটার বুদ্ধি কেতাবের বাইরে হাওয়া খেতে পায় না বলে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমার কথা শুনে তোমার হাসি পাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। দেখো, যদিও আমি মাস্টারি করি তবু ঠাট্টা করতেও পারি। দ্বিতীয়বার চা খেতে ডাকবার পূর্বে এটা জেনে রাখা ভালো।"

"জেনে রাখলুম, বাঁচলুম। অনেক অধ্যাপক দেখেছি, তাঁদের মুখ থেকে হাসি বের করতে ডাক্তার ডাকতে হয়।"

"বাহবা, আমারই দলের লোক দেখছি তুমি। তা হলে এবার আসল কথাটা পাড়া হোক।"

"জানেন বোধহয়, জীবনে আমার স্বামীর ল্যাবরেটরিই ছিল একমাত্র আনন্দ। আমার ছেলে নেই, ওই ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দেব বলে ছেলে খুঁজছি। কানে এসেছে রেবতী ভট্টাচার্যের কথা।"

অধ্যাপক বললেন, "যোগ্য ছেলেই বটে। তার যে লাইনের বিদ্যে সেটাকে শেষপর্যন্ত চালান করতে মালমশলা কম লাগবে না।"

সোহিনী বললে, "আমার রাশকরা টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে। আমার বয়সের বিধবা মেয়েরা ঠাকুর-দেবতার দালালদের দালালি দিয়ে পরকালের দরজা ফাঁক করে নিতে চায়। আপনি শুনে হয়তো রাগ করবেন, আমি ওসব কিছুই বিশ্বাস করি নে।"

চৌধুরী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, "তুমি তবে কী মানো?"

"মানুষের মতো মানুষ যদি পাই, তবে তার সব পাওনা শোধ করে দিতে চাই যতদূর আমার সাধ্য আছে। এই আমার ধর্মকর্ম।"

চৌধুরী বললেন, "হুররে। শিলা ভাসে জলে। মেয়েদের মধ্যেও দৈবাৎ কোথাও কোথাও বুদ্ধির প্রমাণ মেলে দেখছি। আমার একটি বি.এসসি. বোকা আছে, সেদিন হঠাৎ দেখি, গুরুর পা ছুঁয়ে সে উলটো ডিগবাজি খেলতে লেগেছে, মগজ থেকে বুদ্ধি যাচ্ছে উড়ে ফাটা শিমুলের তুলোর মতো। তা, তোমার বাড়িতেই ওকে ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দিতে চাও? তফাতে আর কোথাও হলে হয় না?"

"চৌধুরীমশায় আপনি ভুল করবেন না, আমি মেয়েমানুষ। এইখানেই এই ল্যাবরেটরিতেই হয়েছে আমার স্বামীর সাধনা। তাঁর ওই বেদির তলায় কোনও-একজন যোগ্য লোককে বাতি জ্বালিয়ে রাখবার জন্যে যদি বসিয়ে দিতে পারি, তা হলে যেখানে থাকুন তাঁর মন খুশি হবে।"

চৌধুরী বললেন, "বাই জোভ, এতক্ষণে মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। শুনতে খারাপ লাগল না। একটা কথা জেনে রেখো, রেবতীকে যদি শেষপর্যন্ত পুরোপুরি সাহায্য করতে চাও তা হলে লাখ টাকারও লাইন পেরিয়ে যাবে।"

"গেলেও আমার খুদকুঁড়ো কিছু বাকি থাকবে।"

"কিন্তু পরলোকে যাঁকে খুশি করতে চাও তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে না তো? শুনেছি তাঁরা ইচ্ছে করলে ঘাড়ে চড়ে লাফালাফি করতে পারেন।"

"আপনি খবরের কাগজ পড়েন তো। মানুষ মারা গেলেই তার গুণাবলি প্যারাগ্রাফে প্যারাগ্রাফে ছাপিয়ে পড়তে থাকে। সেই মৃতমানুষের বদান্যতার 'পরে ভরসা করলে তো দোষ নেই। টাকা যে-মানুষ জমিয়েছে অনেক পাপ জমিয়েছে সে তার সঙ্গে, আমরা কী করতে আছি যদি থলি ঝেড়ে স্বামীর পাপ হালকা করতে না পারি। যাক গে টাকা, আমার টাকায় দরকার নেই।"

অধ্যাপক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "কী আর বলব তোমাকে। খনি থেকে সোনা ওঠে, সে খাঁটি সোনা, যদিও তাতে মিশাল থাকে অনেক-কিছু। তুমি সেই ছদ্মবেশী সোনার ঢেলা। চিনেছি তোমাকে। এখন কী করতে হবে বলো।"

"ওই ছেলেটিকে রাজি করিয়ে দিন।"

"চেষ্টা করব, কিন্তু কাজটা খুব সহজ নয়। আর কেউ হলে তোমার দান লাফিয়ে নিত।"

"কোথায় বাধছে বলুন।"

"শিশুকাল থেকে একটি মেয়ে-গ্রহ ওর কুষ্টি দখল করে বসেছে। রাস্তা আগলে রয়েছে অটল অবুদ্ধি।"

"বলেন কী। পুরুষমানুষ—"

"দেখো মিসেস মল্লিক, রাগ করবে কাকে নিয়ে। জানো মেট্রিয়ার্কাল সমাজ কাকে বলে? যে সমাজে মেয়েরাই হচ্ছে পুরুষের সেরা। একসময়ে সেই দ্রাবিড়ি সমাজের ঢেউ বাংলাদেশে খেলত।"

সোহিনী বললে, "সে সুদিন তো গেছে। তলায় তলায় ঢেউ খেলে হয়তো, ঘুলিয়ে দেয় বুদ্ধিসুদ্ধি, কিন্তু হাল যে একলা পুরুষের হাতে। কানে মন্ত্র দেন তাঁরাই, আর জোরে দেন কানমলা। কান ছিঁড়ে যাবার জো হয়।"

"আহা হা, কথা কইতে জানো তুমি। তোমার মতো মেয়েদের যুগ যদি আসে তা হলে মেট্রিয়ার্কাল সমাজে ধোবার বাড়ির ফর্দ রাখি মেয়েদের শাড়ির, আর আমাদের কলেজের প্রিন্সিপলকে পাঠিয়ে দিই ঢেঁকি কুটতে। মনোবিজ্ঞান বলে, বাংলাদেশে মেট্রিয়ার্কি বাইরে নেই, আছে নাড়িতে। মা মা শব্দে হাম্বাধ্বনি আর কোনও দেশের পুরুষমহলে শুনেছ কি। তোমাকে খবর দিচ্ছি, রেবতীর বুদ্ধির ডগার উপরে চড়ে বসে আছে একটি রীতিমতো মেয়ে।"

"কাউকে ভালোবাসে নাকি।"

"আহা সেটা হলে তো বুঝতুম ওর শিরায় প্রাণ করছে ধুকধুক। যুবতীর হাতে বুদ্ধি খোওয়াবার বায়না নিয়েই তো এসেছে, এই তো সেই বয়েস। তা না হয়ে এই কাঁচা বয়সে ও যে এক মালাজপকারিণীর হাতে মালার গুটি বনে গেছে। ওকে বাঁচাবে কিসে— না যৌবন, না বুদ্ধি, না বিজ্ঞান।"

"আচ্ছা, একদিন ওঁকে এখানে চা খেতে ডাকতে পারি কি। আমাদের মতো অশুচির ঘরে খাবেন তো?"

"অশুচি! না খায় তো ওকে আছড়ে আছড়ে এমনি শুচি করে নেব যে বামনাইয়ের দাগ থাকবে না ওর মজ্জায়। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার নাকি একটি সুন্দরী মেয়ে আছে?"

"আছে। পোড়াকপালী সুন্দরীও বটে। তা কী করব বলুন।"

"না না, আমাকে ভুল কোরো না। আমার কথা যদি বলো— সুন্দরী মেয়ে আমি পছন্দই করি। ওটা আমার একটা রোগ বললেই হয়। কিন্তু ওর আত্মীয়েরা বেরসিক, ভয় পেয়ে যাবে।"

"ভয় নেই, আমি নিজের জাতেই মেয়ের বিয়ে দেব ঠিক করেছি।"

এটা একেবারে বানানো কথা।

"তুমি নিজে তো বেজাতে বিয়ে করেছ।"

"নাকাল হয়েছি কম নয়। বিষয়ের দখল নিয়ে মামলা করতে হয়েছে বিস্তর। যে করে জিতেছি সেটা বলবার কথা নয়।"

"শুনেছি কিছু কিছু। বিপক্ষ পক্ষের আর্টিকেলড ক্লার্ককে নিয়ে তোমার নামে গুজব রটেছিল। মকদ্দমায় জিতে তুমি তো সরে পড়লে, সে লোকটা গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যায় আর-কি।"

"এত যুগ ধরে মেয়েমানুষ টিকে আছে কী করে। ছল করার কম কৌশল লাগে না, লড়াইয়ের তাগবাগের সমানই সে, তবে কিনা তাতে মধুও কিছু খরচ করতে হয়। এ হল নারীর স্বভাবদত্ত লড়াইয়ের রীতি।"

"ওই দেখো, আবার তুমি আমাকে ভুল করছ। আমরা বিজ্ঞানী, আমরা বিচারক নই, স্বভাবের খেলা আমরা নিষ্কামভাবে দেখে যাই। সে খেলায় যা ফল হবার তা ফলতে থাকে। তোমার বেলায় ফলটা বেশ হিসেবমতোই ফলেছিল, বলেছিলুম ধন্য মেয়ে তুমি। এ-কথাটাও ভেবেছি, আমি-যে তখন প্রোফেসর ছিলুম, আর্টিকেলড ক্লার্ক ছিলুম না, সেটা আমার বাঁচোয়া। মার্কারি সূর্যের কাছ থেকে যতটুকু দূরে আছে ততটুকু দূরে থেকেই বেঁচে গেল। ওটা গণিতের হিসাবের কথা, ওতে ভালো নেই মন্দ নেই। এসব কথা বোধহয় তুমি বুঝতে শিখেছ।"

"তা শিখেছি। গ্রহগুলো টান মেনে চলে আবার টান এড়িয়ে চলে— এটা একটা শিখে নেবার তত্ত্ব বই কি।"

"আর-একটা কথা কবুল করছি। এইমাত্র তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে একটা হিসেব মনে মনে কষছিলুম, সেও অঙ্কের হিসেব। ভেবে দেখো, বয়সটা যদি অন্তত দশটা বছর কম হত তা হলে খামকা আজ একটা বিপদ ঘটত। কোলিশন ঐটুকু পাশ কাটিয়ে গেল আর-কি! তবু বাষ্পের জোয়ার উঠছে বুকের মধ্যে। ভেবে দেখো, সৃষ্টিটা আগাগোড়াই কেবল অঙ্ক কষার খেলা।"

এই বলে চৌধুরী দুই হাঁটু চাপড়িয়ে হাহা করে হেসে উঠলেন। একটা কথা তাঁর হুঁশ ছিল না যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আগে সোহিনী দু ঘণ্টা ধরে রঙে-চঙে এমন করে বয়স বদল করেছে যে সৃষ্টিকর্তাকে আগাগোড়াই দিয়েছে ঠকিয়ে।

৪

পরের দিন অধ্যাপক এসে দেখলেন সোহিনী রোঁয়া-ওঠা হাড়-বের-করা একটা কুকুরকে স্নান করিয়ে তোয়ালে দিয়ে তার গা মুছিয়ে দিচ্ছে।

চৌধুরী জিগ্‌গেসা করলেন, "এই অপয়মন্তটাকে এত সম্মান কেন।"

"ওকে বাঁচিয়েছি বলে। পা ভেঙেছিল মোটরের তলায় পড়ে, আমি সারিয়ে তুলেছি ব্যান্ডেজ বেঁধে। এখন ওর প্রাণটার মধ্যে আমারও শেয়ার আছে।"

"রোজ রোজ ওই অলুক্ষুণের চেহারা দেখে মন খারাপ হয়ে যাবে না?"

"চেহারা দেখবার জন্যে ওকে তো রাখিনি। মরতে মরতে এই যে ও সেরে উঠছে, এটা দেখতে আমার ভালো লাগে। ওই প্রাণীর বেঁচে থাকবার দরকারটা যখন দিনে দিনে মিটিয়ে দিই, তখন ধর্মকর্ম করতে ছাগলছানার গলায় দড়ি বেঁধে আমাকে কালীতলায় দৌড়তে হয় না। তোমাদের বায়োলজির ল্যাবরেটরির কানাখোঁড়া কুকুর-খরগোশগুলোর জন্যে আমি একটা হাসপাতাল বানাব স্থির করেছি।"

"মিসেস মল্লিক, তোমাকে যতই দেখছি তাক লাগছে।"

"আরও বেশি দেখলে ওটার উপশম হবে। রেবতীবাবুর খবর দেবেন বলেছিলেন, সেটা আরম্ভ করে দিন।"

"আমার সঙ্গে দূর-সম্পর্কে ওদের যোগ আছে। তাই ওদের ঘরের খবর জানি। রেবতীকে জন্ম দিয়েই ওর মা যান মারা। বরাবর ও পিসির হাতে মানুষ। ওর পিসির আচারনিষ্ঠা একেবারে নিরেট। এতটুকু খুঁত নিয়ে ওঁর খুঁতখুঁতুনি সংসারকে অতিষ্ঠ করে তুলত। তাঁকে ভয় না করত এমন লোক ছিল না পরিবারে। ওঁর হাতে রেবতীর পৌরুষ গেল ছাতু হয়ে। স্কুল থেকে ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে পঁচিশ মিনিট লাগত তার জবাবদিহি করতে।"

সোহিনী বললে, "আমি তো জানি পুরুষরা করবে শাসন, মেয়েরা দেবে আদর, তবেই ওজন ঠিক থাকে।"

অধ্যাপক বললেন, "ওজন ঠিক রেখে চলা মরালগামিনীদের ধাতে নেই। ওরা এদিকে ঝুঁকবে, ওদিকে ঝুঁকবে। কিছু মনে কোরো না মিসেস মল্লিক, ওদের মধ্যেও দৈবাৎ মেলে যারা খাড়া রাখে মাথা, চলে সোজা চালে। যেমন— "

"আর বলতে হবে না। কিন্তু আমার মধ্যেও শিকড়ের দিকে মেয়েমানুষ যথেষ্ট আছে। কী ঝোঁকে পেয়েছে দেখছেন না! ছেলে-ধরা ঝোঁক। নইলে আপনাকে বিরক্ত করতেম কি।"

"দেখো, বারবার ওই কথাটা বোলো না। জেনে রেখো আজ ক্লাসের জন্যে তৈরি না হয়েই চলে এসেছি। কর্তব্যের গাফেলি এতই ভালো লাগছে।"

"বোধহয় মেয়েজাতটার 'পরেই আপনার বিশেষ একটু কৃপা আছে।"

"একটুও অসম্ভব নয়। কিন্তু তার মধ্যেও তো ইতরবিশেষ আছে। যা হোক, সে-কথাটা পরে হবে।"

সোহিনী হেসে বললে, "পরে না হলেও চলবে। আপাতত যে-কথাটা উঠেছে শেষ করে দিন। রেবতীবাবুর এত উন্নতি হল কী করে।"

"যা হতে পারত তার তুলনায় কিছুই হয়নি। একটা রিসার্চের কাজে ওর বিশেষ দরকার হয়েছিল উঁচু পাহাড়ে যাবার। ঠিক করেছিল যাবে বদরিকাশ্রমে। আরে সর্বনাশ! পিসিরও ছিল এক পিসি, সে বুড়ি মরবে তো মরুক ওই বদরিকারই রাস্তায়। পিসি বললে, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি, পাহাড়পর্বত চলবে না।' কাজেই তখন থেকে একমনে যা কামনা করছি সে মুখ ফুটে বলবার নয়। থাক্ সে কথা।"

"কিন্তু শুধু পিসিমাদের দোষ দিলে চলবে কেন। মায়ের দুলাল ভাইপোদের হাড় বুঝি কোনোকালে পাকবে না?"

"সে তো পূর্বেই বলেছি। মেট্রিয়ার্কি রক্তের মধ্যে হাম্বাধ্বনি জাগিয়ে তোলে, হতবুদ্ধি হয়ে যায় বৎসরা। আফসোসের কথা কী আর বলব! ওই তো হল নম্বর ওয়ান। তার পরে রেবতী যখন সরকারের বৃত্তি নিয়ে কেমব্রিজে যাবে স্থির হল, আবার এসে পড়ল সেই পিসিমা হাউ হাউ শব্দে। তার বিশ্বাস, ও চলেছে মেমসাহেব বিয়ে করতে। আমি বললুম, নাহয় করল বিয়ে। সর্বনাশ! কথাটা আন্দাজে ছিল, এবার যেন পাকা দেখা হয়ে গেল। পিসি বললে, 'ছেলে যদি বিলেতে যায় তা হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরব।' কোন্ দেবতার দোহাই পাড়লে পাকানো হবে দড়িটা নাস্তিক আমি জানি নে, তাই দড়িটা বাজারে মিলল না। রেবতীকে খুব খানিকটা গাল দিলুম, বললুম স্টুপিড, বললুম ডাম্‌স্, বললুম ইম্‌বেসিল। ব্যস্, ঐখানেই খতম। রেবু এখন ভারতীয় ঘানিতে ফোঁটা ফোঁটা তেল বের করছেন।"

সোহিনী অস্থির হয়ে বলে উঠল, "দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে করছে। একটা মেয়ে রেবতীকে তলিয়ে দিয়েছে, আর-একটা মেয়ে তাকে টেনে তুলবে ডাঙায় এই আমার পণ রইল।"

"পষ্ট কথা বলি ম্যাডাম। জানোয়ারগুলোকে শিঙে ধরে তলিয়ে দেবার হাত তোমার পাকা— লেজে ধরে তাদের উপরে তোলবার হাত তেমন দুরস্ত হয়নি। তা, এখন থেকে অভ্যাসটা শুরু হোক। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— সায়ান্সে এত উৎসাহ তোমার এল কোথা থেকে।"

"সকল রকম সায়ান্সেই সারাজীবন আমার স্বামীর মন ছিল মেতে। তাঁর নেশা ছিল বর্মা চুরুট আর ল্যাবরেটরি। আমাকে চুরুট ধরিয়ে প্রায় বর্মিজ মেয়ে বানিয়ে তুলেছিলেন। ছেড়ে

দিলুম, দেখলুম পুরুষদের চোখে খটকা লাগে। তাঁর আর-এক নেশা আমার উপর দিয়ে জমিয়েছিলেন। পুরুষরা মেয়েদের মজায় বোকা বানিয়ে, উনি আমাকে মজিয়েছিলেন বিদ্যে দিয়ে দিনরাত। দেখুন চৌধুরীমশায়, স্বামীর দুর্বলতা স্ত্রীর কাছে ঢাকা থাকে না, কিন্তু আমি ওঁর মধ্যে কোনোখানে খাদ দেখতে পাইনি। কাছে থেকে যখন দেখতুম, দেখেছি উনি বড়; আজ দূরে থেকে দেখছি, দেখি উনি আরও বড়।"

চৌধুরী জিগ্‌গেসা করলেন, "কোন্‌খানে সবচেয়ে তাঁকে বড় ঠেকছে।"

"বলব? উনি বিদ্বান বলে নয়। বিদ্যার 'পরে ওঁর নিষ্কাম ভক্তি ছিল বলে। উনি একটা পুজোর আলো পুজোর হাওয়ার মধ্যে ছিলেন। আমরা মেয়েরা দেখবার-ছোঁবার মতো জিনিস না পেলে পুজো করবার থই পাই নে। তাঁর এই ল্যাবরেটরি আমার পুজোর দেবতা হয়েছে। ইচ্ছে করে এখানে মাঝে মাঝে ধূপধুনো জ্বালিয়ে শাঁখঘণ্টা বাজাই। ভয় করি আমার স্বামীর ঘৃণাকে। তাঁর দৈনিক পুজো ছিল যখন, এইসব যন্ত্রতন্ত্র ঘিরে জমত কলেজের ছাত্রেরা, শিক্ষা নিত তাঁর কাছ থেকে, আর আমিও বসে যেতুম।"

"ছেলেগুলো সায়ান্সে মন দিতে পারত কি।"

"যারা পারত তাদেরই বাছাই হয়ে যেত। এমন-সব ছেলে দেখেছি যারা সত্যকার বৈরাগী। আবার দেখেছি কেউ কেউ নোট নেবার ছলে একেবারে পাশের ঠিকানায় চিঠি লিখে সাহিত্যচর্চা করত।"

"কেমন লাগত।"

"সত্যি কথা বলব? খারাপ লাগত না। স্বামী চলে যেতেন কাজে, ভাবুকদের মন আশেপাশে ঘুরঘুর করত।"

"কিছু মনে কোরো না, আমি সাইকলজি স্টাডি করে থাকি। জিগ্‌গেসা করি, ওরা কিছু ফল পেত কি।"

"বলতে ইচ্ছে করে না, নোংরা আমি। দু-চারজনের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে যাদের কথা মনে পড়লে আজও মনের মধ্যে মুচড়িয়ে ধরে।"

"দু-চারজন?"

"মন যে লোভী— মাংসমজ্জার নিচে লোভের চাপা আগুন সে লুকিয়ে রেখে দেয়, খোঁচা পেলে জ্বলে ওঠে। আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি, সত্যিকথা বলতে আমার বাধে না। আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদীকুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতাসাবিত্রী। একটা কথা বলি আপনাকে চৌধুরীমশায়, মনে রাখবেন, ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ-বোধ আমার স্পষ্ট ছিল না। কোনও গুরু আমায় তা শিক্ষা দেননি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে, পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে চাপ লাগেনি। কিছু আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারেনি। যাই হোক, তিনি যাবার পথে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জ্বলছে সেই হোমের আগুন।"

"ব্র্যাভো, সত্যিকথা বলতে কী সাহস তোমার।"

"সত্যিকথা বলিয়ে নেবার লোক থাকলে বলা সহজ হয়। আপনি যে খুব সহজ, খুব সত্যি।"

"দেখো, ওই যে চিঠি-লিখিয়ে ছেলেগুলো তোমার প্রসাদ পেয়েছিল, তারা কি এখনও আনাগোনা করে।"

"সেই করেই তো তারা মুছে দিয়েছে আমার মনের ময়লা। দেখলুম জুটছে তারা আমার চেকবইয়ের দিকে লক্ষ্য করে। ভেবেছিল মেয়েমানুষের মোহ মরতে চায় না, ভালোবাসার সিঁধের গর্ত দিয়ে পৌঁছবে তাদের হাত আমার টাকার সিন্দুকে। এত রস আমার নেই তারা তা জানত না। আমার শুকনো পাঞ্জাবি মন। আমি সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে পড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না। আমার ল্যাবরেটরির এক পয়সাও তারা খসাতে পারেনি। আমার প্রাণ শক্ত পাথর হয়ে চেপে আছে আমার দেবতার ভাণ্ডারের দ্বার। ওদের সাধ্য নেই সে পাথর গলাবে। আমাকে যিনি বেছে এনেছিলেন তিনি ভুল করেননি।"

"তাঁকে আমি প্রণাম করি, আর পাই যদি সেই ছেলেগুলোর কান মলে দিই।"

বিদায় নেবার আগে অধ্যাপক একবার ল্যাবরেটরিটা ঘুরে এলেন সোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। বললেন, "এইখানেই মেয়েলিবুদ্ধির চোলাই হয়ে গেছে, অপদেবতার গাদ গেছে নেমে, বেরিয়ে এসেছে খাঁটি স্পিরিট।"

সোহিনী বললে, "যা বলুন, মন থেকে ভয় যায় না। মেয়েলিবুদ্ধি বিধাতার আদিসৃষ্টি। যখন বয়স অল্প থাকে মনের জোর থাকে, তখন সে লুকিয়ে থাকে ঝোপেঝাপে, যেই রক্ত আসে ঠাণ্ডা হয়ে বেরিয়ে আসেন সনাতনী পিসিমা। তার আগেই আমার মরবার ইচ্ছে রইল।"

অধ্যাপক বললেন, "ভয় নেই তোমার, আমি বলছি তুমি সজ্ঞানে মরবে।"

৫

শাদা শাড়ি পরে মাথায় কাঁচাপাকা চুলে পাউডার মেখে সোহিনী মুখের উপর একটা শুচি সাত্ত্বিক আভা মেজে তুললে। মেয়েকে নিয়ে মোটরলঞ্চে করে উপস্থিত হল বোটানিকালে। তাকে পরিয়েছে নীলচে সবুজ বেনারসি শাড়ি, ভিতর থেকে দেখা যায় বাসন্তী রঙের কাঁচুলি। কপালে তার কুঙ্কুমের ফোঁটা, সূক্ষ্ম একটু কাজলের রেখা চোখে, কাঁধের কাছে ঝুলেপড়া গুচ্ছকরা খোঁপা, পায়ে কালো চামড়ার 'পরে লাল মখমলের কাজ-করা স্যান্ডেল।

যে আকাশনিম-বীথিকার তলায় রেবতী রবিবার কাটায়, আগে থাকতে সংবাদ নিয়ে সোহিনী সেইখানেই এসে তাকে ধরলে। প্রণাম করলে একেবারে তার পায়ে মাথা রেখে। বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠল রেবতী।

সোহিনী বললে, "কিছু মনে কোরো না বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি ছত্রির মেয়ে। চৌধুরীমশায়ের কাছে আমার কথা শুনে থাকবে।"

"শুনেছি। কিন্তু এখানে আপনাকে বসাব কোথায়।"

"এই-যে রয়েছে সবুজ তাজা ঘাস, এমন আসন কোথায় পাওয়া যায়! ভাবছ বোধহয়, এখানে আমি কী করতে এসেছি। এসেছি আমার ব্রত উদ্‌যাপন করতে। তোমার মতো ব্রাহ্মণ তো খুঁজে পাব না।"

রেবতী আশ্চর্য হয়ে বললে, "আমার মতো ব্রাহ্মণ?"

"তা না তো কী। আমার গুরু বলেছেন, এখনকার কালের সব-সেরা যে বিদ্যা তাতেই যাঁর দখল তিনিই সেরা ব্রাহ্মণ।"

রেবতী অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "আমার বাবা করতেন যজনযাজন, আমি মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি নে।"

"বলো কী, তুমি যে-মন্ত্র শিখেছ সেই মন্ত্রে সমস্ত জগৎ হয়েছে মানুষের বশ। তুমি ভাবছ মেয়েমানুষের মুখে এসব কথা এল কোথা থেকে। পেয়েছি পুরুষের মতো পুরুষের মুখ থেকে। তিনি আমার স্বামী। যেখানে তাঁর সাধনার পীঠস্থান ছিল, কথা দাও বাবা, সেখানে তোমাকে যেতে হবে।"

"কাল সকালে আমার ছুটি আছে, যাব।"

"তোমার দেখছি গাছপালার শখ। বড় আনন্দ হল। গাছপালার খোঁজে আমার স্বামী গিয়েছিলেন বর্মায়, আমি তাঁর সঙ্গ ছাড়িনি।"

সঙ্গ ছাড়েনি কিন্তু সায়েন্সের চর্চায় নয়। নিজের ভিতর থেকে যে গাদ উঠত ফুটে, স্বামীর চরিত্রের মধ্যেও সেটা অনুমান না করে থাকতে পারত না। সন্দেহের সংস্কার ছিল ওর আঁতে আঁতে। একসময়ে নন্দকিশোরের যখন গুরুতর পীড়া হয়েছিল, তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন, "মরবার একমাত্র আরাম এই যে, সেখান থেকে তুমি আমাকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

সোহিনী বললে, "সঙ্গে যেতে পারি তো।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "সর্বনাশ।"

সোহিনী রেবতীকে বললে, "বর্মা থেকে আসবার সময় এনেছিলুম এক গাছের চারা। বর্মিজরা তাকে বলে ক্লোযাইটানিয়েঙ্গ্। চমৎকার ফুলের শোভা— কিন্তু কিছুতেই বাঁচাতে পারলুম না।"

আজই সকালে স্বামীর লাইব্রেরি ঘেঁটে এ নাম সোহিনী প্রথম বের করেছে। গাছটা চোখেও দেখেনি। বিদ্যার জাল ফেলে বিদ্বানকে টানতে চায়।

অবাক হল রেবতী। জিগ্‌গেসা করলে, "এর লাটিন নামটা কী জানেন।"

সোহিনী অনায়াসে বলে দিলে, "তাকে বলে মিলেটিয়া।"

বললে, "আমার স্বামী সহজে কিছু মানতেন না, তবু তাঁর একটা অন্ধবিশ্বাস ছিল ফলে ফুলে প্রকৃতির মধ্যে যা-কিছু আছে সুন্দর, মেয়েরা বিশেষ অবস্থায় তার দিকে একান্ত করে যদি মন রাখে তা হলে সন্তানরা সুন্দর হয়ে জন্মাবেই। এ-কথা তুমি বিশ্বাস কর কি।"

বলা বাহুল্য, এটা নন্দকিশোরের মত নয়।

রেবতী মাথা চুলকিয়ে বললে, "যথোচিত প্রমাণ তো এখনও জড়ো হয়নি।"

সোহিনী বললে, "অন্তত একটা প্রমাণ পেয়েছি আমার আপন ঘরেই। আমার মেয়ে এমন আশ্চর্য রূপ পেল কোথা থেকে। বসন্তের নানা ফুলের যেন— থাক্, নিজের চোখে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল রেবতী। নাট্যের কোনও সরঞ্জাম বাকি ছিল না।

সোহিনী তার রাঁধুনি বামুনকে সাজিয়ে এনেছে পুজারী বামুনের বেশে। পরনে চেলি, কপালে ফোঁটাতিলক, টিকিতে ফুল বাঁধা, বেলের আঠায় মাজা মোটা পইতে গলায়। তাকে ডেকে বললে, "ঠাকুর, সময় তো হল, নীলুকে এবার ডেকে নিয়ে এসো।"

নীলাকে তার মা বসিয়ে রেখেছিল স্টিমলঞ্চে। ঠিক ছিল ডালি হাতে সে উঠে আসবে, বেশ খানিকক্ষণ তাকে দেখা যাবে সকালবেলার ছায়ায় আলোয়।

ইতিমধ্যে রেবতীকে সোহিনী তন্নতন্ন করে দেখে নিতে লাগল। রঙ মসৃণ শ্যামবর্ণ, একটু হলুদের আভা আছে। কপাল চওড়া, চুলগুলো আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে উপরে তোলা। চোখ বড় নয় কিন্তু তাতে দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছ আলো জ্বলজ্বল করছে, মুখের মধ্যে সেইটেই সকলের চেয়ে চোখে পড়ে। নিচে মুখের বেড়টা মেয়েলি ধাঁচের মোলায়েম। রেবতীর সম্বন্ধে ও যত খবর জোগাড় করেছে তার মধ্যে ও বিশেষ লক্ষ্য করেছে একটা কথা। ছেলেবেলাকার বন্ধুদের ওর উপরে ছিল কান্নাকাটি-জড়ানো সেন্টিমেন্টাল ভালোবাসা। ওর মুখে যে একটা দুর্বল মাধুর্য ছিল, তাতে পুরুষ বালকদের মনে মোহ আনতে পারত।

সোহিনীর মনে খটকা লাগল। ওর বিশ্বাস, মেয়েদের মনকে নোঙরের মতো শক্ত করে আঁকড়ে ধরার জন্যে পুরুষের ভালো দেখতে হওয়ার দরকারই করে না। বুদ্ধিবিদ্যেটাও গৌণ। আসল দরকার পৌরুষের ম্যাগনেটিজম। সেটা তার স্নায়ুর পেশির ভিতরকার বেতার-বার্তার মতো। প্রকাশ পেতে থাকে কামনার অকথিত স্পর্ধারূপে।

মনে পড়ল, নিজের প্রথম বয়সের রসোন্মত্ততার ইতিহাস। ও যাকে টেনেছিল কিম্বা যে টেনেছিল ওকে, তার না ছিল রূপ, না ছিল বিদ্যা, না ছিল বংশগৌরব। কিন্তু কী একটা অদৃশ্য তাপের বিকিরণ ছিল যার অলক্ষ্য সংস্পর্শে সমস্ত দেহ মন দিয়ে ও তাকে অত্যন্ত করে অনুভব করেছিল পুরুষমানুষ বলে। নীলার জীবনে কখন একসময়ে সেই অনিবার্য আলোড়নের আরম্ভ হবে এই ভাবনা তাকে স্থির থাকতে দিত না। যৌবনের শেষ দশাই সকলের চেয়ে বিপদের দশা, সেই সময়টাতে সোহিনীকে অনেকখানি ভুলিয়ে রেখেছিল নিরবকাশ জ্ঞানের চর্চায়। কিন্তু দৈবাৎ সোহিনীর মনের জমি ছিল স্বভাবত উর্বরা। কিন্তু যে জ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক, সব মেয়ের তার প্রতি টান থাকে না। নীলার মনে আলো পৌঁছয় না।

নদীর ঘাট থেকে আস্তে আস্তে দেখা দিল নীলা। রোদ্দুর পড়েছে তার কপালে, তার চুলে। বেনারসি শাড়ির উপরে জরির রশ্মি ঝলমল করে উঠছে। রেবতীর দৃষ্টি এক মুহূর্তের মধ্যে ওকে ব্যাপ্ত করে দেখে নিলে। চোখ নামিয়ে নিল পরক্ষণেই। ছেলেবেলা থেকে তার এই শিক্ষা। যে সুন্দরী মেয়ে মহামায়ার মনোহারিণী লীলা, তাকে আড়াল করে রেখেছে পিসির তর্জনী। তাই যখন সুযোগ ঘটে তখন দৃষ্টির অমৃত ওকে তাড়াতাড়ি এক চুমুকে গিলতে হয়।

মনে মনে রেবতীকে ধিক্কার দিয়ে সোহিনী বললে, "দেখো দেখো, একবার চেয়ে দেখো।"

রেবতী চমকে উঠে চোখ তুলে চাইলে।

সোহিনী বললে, "দেখো তো ডক্টর অব সায়ান্স, ওর শাড়ির রঙের সঙ্গে পাতার রঙের কী চমৎকার মিল হয়েছে।"

রেবতী সসংকোচে বললে, "চমৎকার"

সোহিনী মনে মনে বললে, 'নাঃ আর পারা গেল না।' আবার বললে, "ভিতরে বাসন্তী রঙ উঁকি মারছে, উপরে সবজে নীল। কোন্ ফুলের সঙ্গে মেলে বলো দেখি।"

উৎসাহ পেয়ে রেবতী ভালো করেই দেখলে। বললে, "একটা ফুল মনে পড়ছে কিন্তু উপরের আবরণটা ঠিক নীল নয়, ব্রাউন।"

"কোন্ ফুল বলো তো।"

রেবতী বললে, "মেলিনা।"

"ও, বুঝেছি। তার পাঁচটি পাপড়ি, একটি উজ্জ্বল হলদে, বাকি চারটে শ্যামবর্ণ।"

রেবতী আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে, "এত করে ফুলের পরিচয় জানলেন কী করে?"

সোহিনী হেসে বললে, "জানা উচিত হয় নি বাবা! পুজোর সাজির বাইরের ফুল আমাদের কাছে পরপুরুষ বললেই হয়।"

ডালি হাতে এল ধীরে ধীরে নীলা। মা বললে, "জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? পা ছুঁয়ে প্রণাম কর্।"

'থাক্ থাক।' বলে রেবতী অস্থির হয়ে উঠল। রেবতী আসন করে বসেছিল, পা খুঁজে বের করতে নীলাকে একটু হাতড়াতে হল। শিউরে উঠল রেবতীর সমস্ত শরীর। ডালিতে ছিল দুর্লভ-জাতীয় অর্কিডের মঞ্জরি, রুপোর থালায় ছিল বাদামের তক্তি, পেস্তার বরফি, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, মালাইয়ের বরফি, চৌকো করে কাটা কাটা ভাপা দই।

বললে, "এ সমস্তই তৈরি নীলার নিজের হাতে।"

সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। এসব কাজে নীলার না ছিল হাত, না ছিল মন।

সোহিনী বললে, "একটু মুখে দিতে হয় বাবা, ঘরে তৈরি তোমারই উদ্দেশে।"

ফরমাশে তৈরি বড়বাজারের এক চেনা দোকানে।

রেবতী হাতজোড় করে বললে, "এ সময়ে খাওয়া আমার অভ্যাস নয়। বরং অনুমতি করেন যদি বাসায় নিয়ে যাই।"

সোহিনী বললে, "সেই ভালো। অনুরোধ করে খাওয়ানো আমার স্বামীর আইনে বারণ। তিনি বলতেন, মানুষ তো অজগরের জাত নয়।"

একটা বড় টিফিন-ক্যারিয়রে থাকে-থাকে সোহিনী খাবার সাজিয়ে দিলে। নীলাকে বললে, "দে তো মা, সাজিতে ফুলগুলি ভালো করে সাজিয়ে। এক জাতের সঙ্গে আর-এক জাত মিশিয়ে দিস নে যেন। আর তোর খোঁপা ঘিরে ঐ-যে সিল্কের রুমাল জড়িয়েছিস, ওটা পেতে দিস ফুলগুলির উপরে।"

বিজ্ঞানীর চোখে আটপিপাসুর দৃষ্টি উঠল উৎসুক হয়ে। এ-যে প্রাকৃত জগতের মাপ-ওজনের বাইরেকার জিনিস। নানা রঙের ফুলগুলির মধ্যে নীলার সুঠাম আঙুল সাজাবার লয় রেখে নানা ভঙ্গিতে চলছিল— রেবতীর চোখ ফেরানো দায় হল। মাঝে মাঝে নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে নিচ্ছিল। একদিকে সেই মুখের সীমানা দিয়েছে চুনিমুক্তোপান্নার-মিশেল-করা একহারা হার-জড়ানো চুলের ইন্দ্রধনু, আর-একদিকে বাসন্তীরঙা কাঁচুলির উচ্ছ্রিত রাঙা পাড়টি। সোহিনী মিষ্টান্ন সাজাচ্ছিল কিন্তু ওর একটা তৃতীয় নেত্র আছে যেন। সামনে যে একটা জাদু চলছিল সে ওর লক্ষ্য এড়ায়নি।

নিজের স্বামীর অভিজ্ঞতা অনুসারে সোহিনীর ধারণা ছিল বিদ্যাসাধনার বেড়াদেওয়া ক্ষেত যে-সে গোরুর চরবার ক্ষেত নয়। আজ আভাস পেল বেড়া সকলের পক্ষে সমান ঘন নয়। সেটা ভালো লাগল না।

৬

পরের দিন সোহিনী অধ্যাপককে ডেকে পাঠালে। বললে, "নিজের গরজে আপনাকে ডেকে এনে মিছিমিছি কষ্ট দিই। হয়তো কাজের ক্ষতিও করি।"

"দোহাই তোমার, আরও-একটু ঘন ঘন ডেকো। দরকার থাকে তো ভালো, না থাকে তো আরও ভালো।"

"আপনি জানেন, দামি যন্ত্র সংগ্রহের নেশায় আমার স্বামীর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত না। মনিবদের ফাঁকি দিতেন এই নিষ্কাম লোভে। সমস্ত এশিয়ার মধ্যে এমন ল্যাবরেটরি কোথাও পাওয়া যাবে না, এই জেদ তাঁর মতো আমাকেও পেয়ে বসেছিল। এই জেদই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, নইলে আমার মোদো রক্ত গাঁজিয়ে উঠে উপচিয়ে পড়ত চারদিকে। দেখুন চৌধুরীমশায়, নিজের স্বভাবের মধ্যে মন্দটা যা লেপটিয়ে থাকে সেটা যাঁর কাছে অসংকোচে বলতে পারি আপনি আমার সেই বন্ধু। নিজের কলঙ্কের দিকটা দেখাবার খোলসা দরজা পেলে মন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।"

চৌধুরী বললেন, "যারা সম্পূর্ণটা দেখতে পায় তাদের কাছে সত্যকে চাপা দেবার দরকার করে না। আধা সত্যই লজ্জার জিনিস। পুরোপুরি দেখার ধাত আমাদের, আমরা বিজ্ঞানী।"

"তিনি বলতেন, মানুষ প্রাণপণে প্রাণ বাঁচাতে চায় কিন্তু প্রাণ তো বাঁচে না। সেইজন্যে বাঁচবার শখ মেটাবার জন্যে এমন কিছুকে সে খুঁজে বেড়ায় যা প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি। সেই দুর্লভ জিনিসকে তিনি পেয়েছেন তাঁর এই ল্যাবরেটরিতে। একে যদি আমি বাঁচিয়ে রাখতে না পারি তা হলেই তাঁকে চরম করে মারব স্বামীঘাতিনী হয়ে। আমি এর রক্ষক চাই, তাই খুঁজছিলুম রেবতীকে।"

"চেষ্টা করে দেখলে?"

"দেখেছি, হাতে হাতে ফল পাবার আশা আছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত টিকবে না।"

"কেন।"

"ওঁর পিসিমা যেমনি শুনবেন রেবতীকে টেনেছি কাছে, অমনি তাঁকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবার জন্যে ছুটে আসবেন। ভাববেন, আমার মেয়ের সঙ্গে ওঁর বিয়ে দেবার ফাঁদ পেতেছি।"

"দোষ কী, হলে তো ভালোই হত। কিন্তু তুমি যে বলেছিলে, বেজাতে মেয়ের বিয়ে দেবে না।"

"তখনও আপনার মন জানতুম না, তাই মিথ্যেকথা বলেছিলুম। খুবই চেয়েছিলুম। কিন্তু ছেড়েছি সেই মতলব।"

"কেন।"

"বুঝতে পেরেছি, ও ভাঙন-ধরানো মেয়ে। ওর হাতে যা পড়বে তা আস্ত থাকবে না।"

"কিন্তু ও তো তোমারই মেয়ে।"

"আমারই মেয়ে তো বটে, তাই তো ওকে আঁতের ভিতর থেকেই চিনি।"

অধ্যাপক বললেন, "কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে কেন যে, মেয়েরা পুরুষের ইন্‌স্পিরেশন জাগাতে পারে।"

"আমার সবই জানা আছে। পুরুষের খোরাকে আমিষ পর্যন্ত ভালোই চলে কিন্তু মদ ধরালেই সর্বনাশ। আমার মেয়েটি মদের পাত্র, কানায় কানায় ভরা।"

"তা হলে কী করতে চাও বলো।"

"আমার ল্যাবরেটরি দান করতে চাই পাব্লিককে।"

"তোমার একমাত্র মেয়েকে এড়িয়ে দিয়ে?"

"মেয়েকে? ওকে দান করলে সে দান পৌঁছবে কোন্ রসাতলে কী করে জানব। আমার ট্রাস্টসম্পত্তির প্রেসিডেন্ট করে দেব রেবতীকে। তাতে তো পিসির আপত্তি হতে পারবে না?"

"মেয়েদের আপত্তির যুক্তি যদি ধরতেই পারব তা হলে পুরুষ হয়ে জন্মাতে গেলুম কেন? কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি নে, ওকে যদি জামাই না করবে তা হলে প্রেসিডেন্ট করতে চাও কেন।"

"শুধু যন্ত্রগুলো নিয়ে কী হবে? মানুষ চাই ওদের প্রাণ দিতে। আর-একটা কথা এই— আমার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে একটাও নতুন যন্ত্র আনা হয়নি। টাকার অভাবে নয়। কিনতে হলে একটা লক্ষ্য ধরে কিনতে হয়। খবর জেনেছি, রেবতী ম্যাগনেটিজম নিয়ে কাজ করছেন। সেই পথে সংগ্রহ এগিয়ে চলুক, যত দাম লাগে লাগুক-না।"

"কী আর বলব, পুরুষমানুষ যদি হতে তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে নেচে বেড়াতুম। তোমার স্বামী রেল-কোম্পানির টাকা চুরি করেছিলেন, তুমি চুরি করে নিয়েছ তাঁর পুরুষের মনখানা। এমন অদ্ভুত কলমের-জোড়-লাগানো বুদ্ধি আমি কখনও দেখিনি। আমারও পরামর্শ নেওয়া তুমি-যে দরকার বোধ কর, এই আশ্চর্য।"

"তার কারণ আপনি-যে খুব খাঁটি, ঠিক কথা বলতে জানেন।"

"হাসালে তুমি। তোমাকে বেঠিক কথা বলে ধরা পড়ব, এতবড় নিরেট বোকা আমি নই। তা হলে লাগা যাক এবার— জিনিসপত্র ফর্দ করা, দর যাচাই করা, ভালো উকিল ডেকে তোমার স্বত্ব বিচার করা, আইনকানুন বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি অনেক হাঙ্গামা আছে।"

"এসব দায় কিন্তু আপনারই।"

"সেটা হবে নামমাত্র। বেশ ভালো করেই জানো, যা তুমি বলাবে তাই বলব, যা করাবে তাই করব। আমার লাভটা এই যে দু বেলা দেখা হবে তোমার সঙ্গে। তোমাকে যে কী চক্ষে দেখেছি তুমি তো জানো না।"

সোহিনী চৌকি থেকে উঠে এসে ধাঁ করে এক হাতে চৌধুরীর গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমো খেয়ে চট্ করে সরে গেল, ভালোমানুষের মতো বসল গিয়ে চৌকিতে।

"ওই রে সর্বনাশের শুরু হল দেখছি।"

"সে ভয় যদি একটুও থাকত তা হলে কাছেও এগোতুম না। এ বরাদ্দ আপনার জুটবে মাঝে মাঝে।"

"ঠিক বলছ?"

"ঠিকই বলছি। আমার এতে খরচ নেই, আপনারও-যে বেশি কিছু পাওনা আছে, মুখের ভাব দেখে তা বোধ হচ্ছে না।"

"অর্থাৎ বলতে চাও এ হচ্ছে মরা কাঠে কাঠঠোকরার ঠোকর দেওয়া।— চললুম উকিলবাড়িতে।"

"কাল একবার আসবেন এ পাড়াতে।"

"কেন, কী করতে।"

"রেবতীর মনে দম দিতে।"

"আর নিজের মনটা খুইয়ে বসতে।"

"মন কি আপনার একলারই আছে।"

"তোমার মনের কিছু বাকি আছে নাকি।"

"উচ্ছিষ্ট অনেক পড়ে আছে।"

"তাতে এখনও অনেক বাঁদর নাচানো চলবে।"

৭

তার পরদিনে রেবতী ল্যাবরেটরিতে নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত বিশ মিনিট আগে এসেই উপস্থিত। সোহিনী প্রস্তুত ছিল না, আটপৌরে কাপড়েই তাড়াতাড়ি চলে এল ঘরে। রেবতী বুঝতে পারলে গলদ হয়েছে। বললে, "আমার ঘড়িটা ঠিক চলছে না দেখছি।"

সোহিনী সংক্ষেপে বললে, "নিশ্চয়।"

একসময়ে একটু কী শব্দ শুনে রেবতী মনে মনে চমকে উঠে দরজার দিকে তাকালে। সুখন বেহারাটা গ্লাসকেসের চাবি নিয়ে এল ঘরে।

সোহিনী জিগ্‌গেসা করলে, "এক পেয়ালা চা আনিয়ে দেব কি।"

রেবতী ভাবলে বলা উচিত, হ্যাঁ। বললে, "দোষ কী।"

ও বেচারার চা অভ্যাস নেই, সর্দির আভাস দিলে বেলপাতাসিদ্ধ গরম জল খেয়ে থাকে। মনে মনে বিশ্বাস ছিল স্বয়ং নীলা আসবে পেয়ালা হাতে।

সোহিনী জিগ্‌গেসা করলে, "তুমি কি কড়া চা খাও।"

ও ফস্ করে বলে বসল, "হ্যাঁ।"

ভাবলে এক্ষেত্রে হ্যাঁ বলাটাই পাকা দস্তুর। এল চা, সেটা কড়া সন্দেহ নেই। কালির মতো রঙ, নিমের মতো তিতো। চা আনলে মুসলমান খানসামা। এটাও ওকে পরীক্ষা করবার জন্যে। আপত্তি করতে ওর মুখে কথা সরল না। এই সংকোচ ভালো লাগল না সোহিনীর। খানসামাকে বললে, "চা-টা ঢেলে দাও-না মোবারক, ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।"

খানসামার হাতের পরিবেষণ-প্রত্যাশায় রেবতী বিশ মিনিট আগে এখানে আসেনি।

কী দুঃখে-যে মুখে চামচ উঠছিল অন্তর্যামীই জানছিলেন, আর জানছিল সোহিনী। হাজার হোক মেয়েমানুষ, দুর্গতি দেখে বললে, "ও পেয়ালাটা থাক্। দুধ ঢেলে দিচ্ছি, তার সঙ্গে কিছু ফল খেয়ে নাও। সকাল সকাল এসেছ, বোধহয় কিছু খেয়ে আসা হয়নি।" কথাটা সত্য। রেবতী ভেবেছিল আজও সেই বোটানিকালের পুনরাবৃত্তি হবে। কাছ দিয়েও গেল না, মুখে রয়ে গেল কড়া চায়ের তিতো স্বাদ আর মনে রয়েছে আশাভঙ্গের তিতো অভিজ্ঞতা।

এমন সময় প্রবেশ করলেন অধ্যাপক; ঘরে ঢুকেই রেবতীর পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, "কী রে, হল কী, সব যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম! খুকুর মতো বসে বসে দুধ খাচ্ছিস ঢকে ঢক। চারদিকে যা দেখছিস এ কি খোকাবাবুর খেলনার দোকান। যাদের চোখ আছে তারা দেখেছে, মহাকালের চেলারা এইখানে আসে তাণ্ডবনৃত্য করতে।"

"আহা কেন বকছেন! না-খেয়েই ও বেরিয়েছিল আজ সকালে। এল যখন, তখন দেখলুম মুখ যেন শুকনো।"

"ওই রে পিসিমা দি সেকেন্ড। এক পিসিমা দেবে এক গালে চাপড়, আর-এক পিসিমা দেবে অন্য গালে চুমো। মাঝখানে পড়ে ছেলেটা যাবে ভিজে কাদা হয়ে। আসল কথা কী জানো, লক্ষ্মী যখন আপনি সেধে আসেন চোখে পড়েন না; যারা সাত মুল্লুক ঘুরে তাঁকে খুঁজে বের করে, ধরা দেন তিনি তাদেরই কাছে। না-চেয়ে পাওয়ার মতো না-পাওয়ার আর রাস্তা নেই। আচ্ছা বলো দেখি মিসেস— দূর হোক গে ছাই মিসেস, আমি ডাকবই তোমাকে সোহিনী বলে, এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর।"

"মরণ আমার, রাগ করতে যাব কেন। ডাকুন আমাকে সোহিনী বলে, সুহি বললে আমার কান জুড়িয়ে যাবে।"

"গোপন কথাটা প্রকাশ করেই বলি। তোমার ওই সোহিনী নামটির সঙ্গে আর-একটি শব্দের মিল আছে, বড় খাঁটি তার অর্থ। সকালে ঘুম থেকে উঠেই হিনি হিনি কিনি কিনি রবে ওই দুটি শব্দ মিলিয়ে মনে মনে খঞ্জনি বাজাতে থাকি।"

"কেমিস্ট্রির রিসর্চে মিল করা আপনার অভ্যাস আছে, ওটা তারই একটা ফেঁকড়া।"

"মিল করতে গিয়ে মরেও অনেক লোক। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে নেই— ঘোরতর দাহ্য পদার্থ।"

এই বলে হাঃ হাঃ শব্দে উচ্চাহাস্য করে উঠলেন।

"নাহ্, ওই ছোকরাটার সামনে এসব কথার আলোচনা করতে নেই। বাবুদের কারখানায় আজ পর্যন্ত ও অ্যাপ্রেন্টিসি শুরু করেনি। পিসিমার আঁচল ওকে আগলে আছে, সে আঁচল ননকমবাসটিবল।"

রেবতীর মেয়েলি মুখ লাল হয়ে উঠছিল।

"সোহিনী, আমি তোমাকে জিগ্‌গেসা করতে যাচ্ছিলুম, আজ সকালে তুমি কি ওকে আফিম খাইয়ে দিয়েছিলে। অমন ঝিমিয়ে পড়ছে কেন।"

"খাইয়ে যদি থাকি সেটা না-জেনে।"

"রেবু, ওঠ্ বলছি ওঠ্। মেয়েদের কাছে অমন মুখচোরা হয়ে থাকতে নেই। ওতে ওদের আস্পর্ধা বেড়ে যায়। ওরা তো ব্যামোর মতো পুরুষের দুর্বলতা খুঁজে বেড়ায়, ছিদ্র পেলেই টেম্পারেচর চড়িয়ে দেয় হু হু করে। সাবজেক্টটা জানা আছে, ছেলেগুলোকে সাবধান করতে হয়। আমার মতো যারা ঘা খেয়েছে, মরেনি, তাদের কাছ থেকেই পাঠ নিতে হয়। রেবু, কিছু মনে করিস নে বাবা। যারা কথা কয় না, চুপ করে থাকে, তারাই সবচেয়ে ভয়ংকর। চল্ দেখি, তোকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। ওই দেখ্ দুটো গ্যাল্‌ভানোমিটর, একেবারে হাল কায়দার। এই দেখ্ হাই ভ্যাকুয়ম পম্প্, আর এটা মাইক্রোফোটোমিটর, এ ছেলে-পাস-করাবার কলার ভেলা নয়। একবার এখানে আসন গেড়ে বোস্ দেখি। সেই তোমার টাকপড়া মাথার প্রোফেসর— নাম করতে চাই নে— দেখি কেমন তার মুখ চুন হয়ে না যায়। আমার ছাত্র হয়ে যখন তুই বিদ্যে শুরু করলি আমি তোকে বলিনি কি তোর নাকের সামনে ঝুলছে যাকে কথায় বলে ভবিষ্যৎ? হেলাফেলা করে সেটাকে ফোঁপরা করে দিস নে যেন। তোর জীবনীর প্রথম চ্যাপ্টারের এককোণে আমার নামটাও ছোট অক্ষরে লেখা যদি থাকে, সেটা হবে আমার মস্ত গুরুদক্ষিণা।"

দেখতে দেখতে বিজ্ঞানী জেগে উঠল। জ্বলে উঠল তার দুই চোখ। চেহারাটা একেবারে ভিতর থেকে গেল বদলে। মুগ্ধ হয়ে সোহিনী বললে, "তোমাকে যে-কেউ জানে তারা সকলেই

তোমার এতবড় উন্নতির আশা করে যা প্রতিদিনের জিনিস নয়, যা চিরদিনের। কিন্তু আশা যতই বড়, ততই বড় তার বাধা ভিতরে বাইরে।"

অধ্যাপক রেবতীর পিঠে আর-একবার দিলে একটা মস্ত চাপড়। ঝনঝন করে উঠল তার শিরদাঁড়া। চৌধুরী তাঁর মস্ত ভারী গলায় বললেন, "দেখ্ রেবু, যে মহৎ ভবিষ্যতের বাহন হওয়া উচিত ছিল ঐরাবত, কৃপণ বর্তমান চাপিয়ে দেয় তাকে গোরুর গাড়িতে, কাদায় পড়ে থাকে সে অচল হয়ে। শুনছ, সোহিনী, সুহি?— না না ভয় নেই, পিঠে চাপড় মারব না। বলো সত্যি করে, কথাটা আমি কেমন গুছিয়ে বলেছি।"

"চমৎকার।"

"ওটা লিখে রেখো তোমার ডায়ারিতে।"

"তা রাখব।"

"কথাটার মানেটা বুঝেছিস তো রেবি?"

"বোধহয় বুঝেছি।"

"মনে রাখিস মস্ত প্রতিভার মস্ত দায়িত্ব। ও তো কারও নিজের জিনিস নয়। ওর জবাবদিহি অনন্তকালের কাছে। শুনছ সুহি, শুনছ? কথাটা কেমন বলেছি বলো তো ভাই।"

"খুব ভালো বলেছেন। আগেকার দিনের রাজা থাকলে গলা থেকে মালা খুলে—'

"তারা তো মরেছে সব, কিন্তু—"

"ওই কিন্তুটুকু মরেনি, মনে থাকবে।"

রেবতী বললে, "ভয় নেই, কিছুতে আমাকে দুর্বল করবে না।"

সোহিনীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল। সোহিনী তাড়াতাড়ি আটকিয়ে দিলে।

চৌধুরী বললেন, "আরে, করলে কী। পুণ্যকর্ম না-করার দোষ আছে, পুণ্যকর্মে বাধা দেওয়ার দোষ আরও বেশি।"

সোহিনী বললে, "প্রণাম যদি করতে হয় তো ঐখানে—" বলে বেদির উপরে বসানো নন্দকিশোরের মূর্তি দেখিয়ে দিলে। ধূপধুনো জ্বলছে, ফুলে ভরে আছে থালা।

বললে, "পাতকীকে উদ্ধার করার কথা পুরাণে পড়েছি। আমাকে উদ্ধার করেছেন ওই মহাপুরুষ। অনেক নীচে নামতে হয়েছিল, শেষকালে তুলে বসাতে পেরেছেন— পাশে বললে মিথ্যে হবে, তাঁর পায়ের তলায়। বিদ্যার পথে মানুষকে উদ্ধার করবার দীক্ষা তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন। বলে গিয়েছেন যেন মেয়েজামাইয়ের গুমর বাড়াবার জন্যে তাঁর জীবনের খনিখোঁড়া রত্ন ছাইয়ের গাদায় হারিয়ে না ফেলি।" বললেন, 'ঐখানে রেখে গেলেম আমার সদ্‌গতি, আর সদ্‌গতি আমার দেশের।'

অধ্যাপক বললেন, "শুনলি তো রেবু? এটা হবে ট্রাস্ট সম্পত্তি, তোকে দেওয়া হবে তার কর্তৃত্ব।"

রেবতী ব্যস্ত হয়ে বললে, "কর্তৃত্ব নেবার যোগ্য আমি নই। আমি পারব না।"

সোহিনী বললে, "পারবে না! ছি, এ কি পুরুষের মতো কথা।"

রেবতী বললে, "আমি চিরদিন পড়াশুনো করে এসেছি, এরকম কাজের ভার কখনও নিইনি।"

চৌধুরী বললেন, "ডিম ফোটবার আগে কখনও হাঁস সাঁতার দেয়নি। আজ তোমার ডিমের খোলা ভাঙবে।"

সোহিনী বললে, "ভয় নেই তোমার, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।"

রেবতী আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল।

সোহিনী অধ্যাপকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। চৌধুরী বললেন, "জগতে বোকা অনেক রকম আছে, পুরুষ-বোকা সকল বোকার সেরা। কিন্তু মনে রেখো, দায়িত্ব হাতে না-পেলে দায়িত্বের যোগ্যতা জন্মায় না। একজোড়া হাত পেয়েছে মানুষ তাই সে হয়েছে মানুষ, একজোড়া খুর পেলেই তার সঙ্গে সঙ্গে মলবার যোগ্য লেজ আপনি গজিয়ে উঠত। তুমি কি রেবতীর হাতের বদলে খুর দেখতে পেয়েছ নাকি।"

"না, আমার ভালো লাগছে না। মেয়ের হাতেই যারা মানুষ কোনোকালে তাদের দুধে-দাঁত ভাঙে না। কপাল আমার! আপনি থাকতে আমি আর-কারও কথা কেন ভাবতে গেলুম।"

"খুশি হলুম শুনে। একটুখানি বুঝিয়ে দাও কী গুণ আছে আমার।"

"লোভ নেই আপনার একটুও।"

"এত বড় নিন্দের কথা! লোভের মতো জিনিসকে লোভ করি নে? খুবই করি—"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তাঁর গালে দুটো চুমো দিয়ে সোহিনী সরে গেল।

"কোন্ খাতায় জমা হল এটা সোহিনী।"

"আপনার কাছে যে ঋণ পেয়েছি সে তো শোধ করতে পারি নে, তারই সুদ দিচ্ছি।"

"প্রথম দিন পেয়েছি একটি, আজ পেলুম দুটি। কেবলই বেড়ে চলবে নাকি।"

"বাড়বে বই কি, চক্রবৃদ্ধির নিয়মে।"

৮

চৌধুরী বললেন, "সোহিনী, তোমার স্বামীর শ্রাদ্ধে শেষকালে আমাকে পুরুত বানিয়ে দিলে? সর্বনাশ, এ কি কম দায়িত্ব। যার অস্তিত্ব হাতড়িয়ে পাওয়া যায় না তাকে খুশি করা! এ তো বাঁধাদস্তুরের দানদক্ষিনে নয় যে—"

"আপনিও তো বাঁধাদস্তুরের গুরুঠাকুর নন, আপনি যা করবেন সেটাই হবে পদ্ধতি। দানের ব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছেন তো?"

"কদিন ধরে ওই কাজই করেছি, দোকানবাজার কম ঘুরিনি। দানসামগ্রী সাজানো হয়ে গেছে নিচের বড় ঘরটাতে। ইহলোকস্থিত আত্মা যারা এগুলো আত্মসাৎ করবে তারা পেট ভরে খুশি হবে, সন্দেহ নেই।"

চৌধুরীর সঙ্গে নিচে গিয়ে সোহিনী দেখলে, সায়ান্স-পড়ুয়া ছেলেদের জন্যে নানা যন্ত্র, নানা মডেল, নানা দামি বই, নানা মাইক্রোস্কোপের স্লাইড্স্, নানা বায়োলজির নমুনা। প্রত্যেক সামগ্রীর সঙ্গে নাম ও ঠিকানা-লেখা কার্ড। আড়াইশো ছেলের জন্যে চেক লেখা হয়েছে এক বৎসরের বৃত্তির। খরচের জন্যে কিছুমাত্র সংকোচ করা হয়নি। বড় বড় ধনীদের শ্রাদ্ধে যে ব্রাহ্মণবিদায় হয় তার চেয়ে এর ব্যয়ের প্রসার অনেক বেশি, অথচ বিশেষ করে চোখে পড়ে না এর সমারোহ।

"পুরুতবিদায়ের কী দক্ষিণা দিতে হবে, সেটা তো আপনি ধরে দেননি ।"

"আমার দক্ষিণা তোমার খুশি।"

"খুশির সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্যে রেখেছি এই ক্রনোমিটার। জর্মনি থেকে আমার স্বামী এটা কিনেছিলেন, বরাবর তাঁর রিসর্চের কাজে লেগেছিল।"

চৌধুরী বললেন, "যা মনে আসছে তার ভাষা নেই। বাজে কথা বলতে চাইনে, আমার পুরুতের কাজ সার্থক হল।"

"আর-একটি লোক আছে, আজ তাকে ভুলতে পারিনে— সে আমাদের মানিকের বিধবা বউ।"

"মানিক বলতে কাকে বোঝায়।"

"সে ছিল ওঁর ল্যাবরেটরির হেডমিস্ত্রি। আশ্চর্য তার হাত ছিল। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজে এক চুল তার নড়চড় হত না, কলকব্জার তত্ত্ব বুঝে নিতে তার বুদ্ধি ছিল অভ্রান্ত। তাকে উনি অতিনিকট বন্ধুর মতো দেখতেন। গাড়ি করে নিয়ে যেতেন বড় বড় কারখানার কাজ দেখাতে। এদিকে সে ছিল মাতাল, ওঁর অ্যাসিস্টেন্টরা তাকে ছোটোলোক বলে অবজ্ঞা করত। উনি বলতেন, ও যে গুণী, তার সে গুণ বানিয়ে তোলা যায় না, সে গুণ খুঁজে মিলবে না। ওঁর কাছে তার সম্মান পুরোমাত্রায় ছিল। এর থেকে বুঝবেন কেন যে উনি আমাকে শেষপর্যন্ত এত মান দিয়েছিলেন। আমার মধ্যে যে-মূল্য তিনি দেখেছিলেন তার তুলনায় দোষের ওজন ওঁর কাছে ছিল খুব সামান্য। যে জায়গায় আমার মতো কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে তিনি অসম্ভব রকম বিশ্বাস করেছিলেন, সে জায়গায় সে বিশ্বাস আমি কোনোদিন একটুমাত্র নষ্ট করিনি। আজও মনপ্রাণ দিয়ে রক্ষা করছি। এতটা তিনি আর-কারও কাছে পেতেন না। যেখানে আমি ছিলেম ছোটো সেখানে আমি তাঁর চোখে পড়িনি, যেখানে আমি ছিলুম বড় সেখানে তিনি আমাকে পুরো সম্মান দিয়েছেন। আমার মূল্য যদি তাঁর চোখে না পড়ত তা হলে আমি কোথায় তলিয়ে যেতুম বলুন তো। আমি খুব খারাপ, কিন্তু আমি নিজেই বলছি আমি খুব ভালো, নইলে তিনি আমাকে কখনও সহ্য করতে পারতেন না।"

"দেখো সোহিনী, আমি অহংকার করে বলব যে আমি প্রথম থেকেই জেনেছি তুমি খুব ভালো। শস্তা দরের ভালো হলে কলঙ্ক লাগলে দাগ উঠত না।"

"যাক গে, আমাকে আর যে লোক যা মনে করুক-না, তিনি আমাকে যা মান দিয়েছেন সে আজ পর্যন্ত টিকে আছে, আমার শেষদিন পর্যন্ত থাকবে।"

"দেখো সোহিনী, তোমাকে যত দেখছি ততই জানছি, তুমি সে জাতের সহজ মেয়েমানুষ নও যারা স্বামী নামটা শুনলেই গলে পড়ে।"

"না, তা নই; আমি দেখেছি ওঁর মধ্যে শক্তি, প্রথম দিন থেকে জেনেছি উনি মানুষ, আমি শাস্ত্র মিলিয়ে পতিব্রতাগিরি করতে বসিনি। আমি জাঁক করেই বলছি, আমার মধ্যে যে-রত্ন আছে সে একা ওঁরই কণ্ঠহারে দোলবার মতো, আর কারও নয়।"

এমন সময় নীলা ঘরে এসে ঢুকে পড়ল। বললে, "অধ্যাপকমশায়, কিছু মনে করবেন না, মায়ের সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

"কিছু না মা, আমি এখন যাচ্ছি ল্যাবরেটরিতে। রেবতী কী রকম কাজ করছে দেখে আসি গে।"

নীলা বললে, "কোনও ভয় নেই। কাজ ভালোই চলছে। আমি এক-একদিন জানালার বাইরে থেকে দেখেছি, উনি মাথা গুঁজে লিখছেন, নোট নিচ্ছেন, কলম কামড়ে ধরে ভাবছেন।

আমার প্রবেশ নিষেধ, পাছে স্যার আইজাকের গ্রাভিটেশন যায় নড়ে। সেদিন মা কাকে বলছিলেন উনি ম্যাগনেটিজম নিয়ে কাজ করছেন, তাই পাশ দিয়ে কেউ গেলেই কাঁটা নড়ে যায়, বিশেষত মেয়েরা।"

চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, "মা, ল্যাবরেটরি ভিতরেই আছে, ম্যাগনেটিজম নিয়ে কাজ চলছেই, কাঁটা যাঁরা নাড়িয়ে দেন তাঁদের ভয় করতেই হয়। দিগ্‌ভ্রম ঘটায় যে। তবে চললুম।"

নীলা মাকে বললে, "আমাকে আর কতদিন তোমার আঁচলের গাঁঠ দিয়ে বেঁধে রাখবে। পেরে উঠবে না, কেবল দুঃখ পাবে।"

"তুই কী করতে চাস্ বল্।"

নীলা বললে, "তুমি তো জানোই মেয়েদের জন্যে একটা হাইয়র স্টাডি মুভমেন্ট খোলা হয়েছে, তুমি তাতে অনেক টাকা দিয়েছ। সেখানে আমাকে কেন কাজে লাগাও না।"

"আমার ভয় আছে পাছে তুই ঠিকমতো না চলিস।"

"সব চলাই বন্ধ করে দেওয়াই কি ঠিক চলার রাস্তা।"

"তা নয়, তা তো জানি, সেই তো আমার ভাবনা।"

"তুমি না-ভেবে একবার আমাকে ভাবতে দাও-না। সে তো দিতেই হবে। আমি তো এখন খুকি নই। তুমি ভাবছ সেইসব পাব্লিক জায়গায় নানা লোকের যাওয়া-আসা আছে, সে একটা বিপদ। জগৎসংসারে লোকচলাচল তো বন্ধ হবে না তোমার খাতিরে। আর তাদের সঙ্গে আমার জানাশুনো একেবারেই ঠেকিয়ে রাখবে যে, সে আইন তো তোমার হাতে নেই।"

"জানি সব জানি, ভয় করে ভয়ের কারণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। তা হলে তুই ওদের হাইয়র স্টাডি সার্কলে ভরতি হতে চাস?"

"হ্যাঁ চাই।"

"আচ্ছা তাই হবে। সেখানকার পুরুষ অধ্যাপকদের একে একে দিবি জাহান্নমে সে জানি। কেবল একটি কথা দিতে হবে আমাকে। কোনোমতেই তুই রেবতীর কাছে ঘেঁষতে পাবি নে। আর, কোনও ছুতোতেই ঢুকবি নে তার ল্যাবরেটরিতে।"

"মা, তুমি আমাকে কী মনে কর ভেবে পাই নে। কাছে ঘেঁষতে যাব তোমার ওই খুদে স্যার আইজাক নিউটনের, এমন রুচি আমার?— মরে গেলেও না।"

সংকোচ বোধ করলে রেবতী শরীরটাকে নিয়ে যে-রকম আঁকুবাঁকু করে তারই নকল করে নীলা বললে, "ওই স্টাইলের পুরুষকে নিয়ে আমার চলবে না। যেসব মেয়েরা ভালোবাসে বুড়ো খোকাদের মানুষ করতে, ওকে জিইয়ে রেখে দেওয়া ভালো তাদেরই জন্যে। ও মারবার যোগ্য শিকারই নয়।"

"একটু বেশি বাড়িয়ে কথা বলছিস নীলা, তাই ভয় হচ্ছে ওটা ঠিক তোর মনের কথা নয়। তা হোক, ওর সম্বন্ধে তোর মনের ভাব যাই হোক, ওকে যদি মাটি করতে চাস তা হলে সে তোর পক্ষে ভালো হবে না।"

"কখন তোমার কী মর্জি কিছুই বুঝতে পারি নে মা। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্যে তুমি আমাকে সাজিয়ে পুতুল গড়ে তুলেছিলে, সে কি আমি বুঝতে পারিনি? সেইজন্যেই কি

তুমি আমাকে ওর বেশি কাছে আনাগোনা করতে বারণ করছ, পাছে চেনাশোনার ঘেঁষ লেগে পালিশ নষ্ট হয়ে যায়।"

"দেখ্ নীলা, আমি তোকে বলে দিচ্ছি তোর সঙ্গে ওর বিয়ে কিছুতেই হতে পারবে না।"

"তা হলে আমি যদি মোতিগড়ের রাজকুমারকে বিয়ে করি?"

"ইচ্ছে হয় তো করিস।"

"সুবিধে আছে, তার তিনটে বিয়ে, আমার দায় অনেকটা হালকা হবে, আর সে মদ খেয়ে ঢলাঢলি করে নাইটক্লাবে— তখন আমি অনেকটা ছুটি পাব।"

"আচ্ছা বেশ সেই ভালো। রেবতীর সঙ্গে তোর বিয়ে হতে দেব না।"

"কেন, তোমার স্যার আইজাক নিউটনের বুদ্ধি আমি ঘুলিয়ে দেব মনে কর?"

"সে তর্ক থাক্ , যা বললুম তা মনে রাখিস।"

"'উনি নিজেই যদি হ্যাংলাপনা করেন।"

"তা হলে এ পাড়া তাকে ছাড়তে হবে— তোর অন্নে তাকে মানুষ করিস, তোর বাপের তহবিল থেকে এক কড়িও সে পাবে না।"

"সর্বনাশ। তা হলে নমস্কার স্যার আইজাক নিউটন।"

সেদিনকার পালা সংক্ষেপে এই পর্যন্ত।

৯

"চৌধুরীমশায়, আর সবই চলছে ভালো, কেবল আমার মেয়ের ভাবনায় সুস্থির হতে পারছি নে। ও যে কোন্ দিকে তাক করতে শুরু করেছে বুঝতে পারছি নে।"

চৌধুরী বললেন, "আবার ওর দিকে তাক করছে কারা সেটাও একটা ভাববার কথা। হয়েছে কী, এরই মধ্যে রটে গেছে ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্যে তোমার স্বামী অগাধ টাকা রেখে গেছে। মুখে মুখে তার অঙ্কটা বেড়েই চলেছে। এখন রাজত্ব আর রাজকন্যা নিয়ে বাজারে একটা জুয়োখেলার সৃষ্টি হয়েছে।"

"রাজকন্যাটি মাটির দরে বিকোবে তা জানি, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে রাজত্ব শস্তায় বিকোবে না।"

"কিন্তু লোকের আমদানি শুরু হয়েছে। সেদিন হঠাৎ দেখি, আমাদেরই অধ্যাপক মজুমদার ওরই হাত ধরে বেরিয়ে এল সিনেমা থেকে। আমাকে দেখেই ঘাড় বেঁকিয়ে নিল। ছেলেটা ভালো ভালো বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়, দেশের মঙ্গলের দিকে ওর বুলি খুব সহজে খেলে। কিন্তু সেদিন ওর বাঁকা ঘাড় দেখে স্বদেশের জন্যে ভাবনা হল।"

"চৌধুরীমশায়, আগল ভেঙেছে।"

"ভেঙেছে বই-কি। এখন এই গরিবকেই নিজের ঘটিবাটি সামলাতে হবে।"

"মজুমদার-পাড়ায় মড়ক লাগে লাগুক, আমার ভয় রেবতীকে নিয়ে।"

চৌধুরী বললেন, "আপাতত ভয় নেই। খুব ডুবে আছে। কাজ করছে খুব চমৎকার।"

"চৌধুরীমশায়, ওর বিপদ হচ্ছে সায়ান্সে ও যতবড় ওস্তাদই হোক, তুমি যাকে মেট্রিয়ার্কি বলো সে-রাজ্যের ও ঘোর আনাড়ি।"

"সে-কথা ঠিক। ওর একবারও টিকে দেওয়া হয়নি। ছোঁয়াচ লাগলে বাঁচানো শক্ত হবে।"

"রোজ একবার কিন্তু ওকে আপনার দেখে যেতে হবে।"

"কোথা থেকে ও আবার ছোঁয়াচ না নিয়ে আসে। শেষকালে এ বয়সে আমি না মরি। ভয় কোরো না, মেয়েমানুষ যদিও, তবুও আশা করি ঠাট্টা বুঝতে পারো। আমি পার হয়ে গেছি এপিডেমিকের পাড়াটা। এখন ছোঁওয়া লাগলেও ছোঁয়াচ লাগে না। কিন্তু একটা মুশকিল ঘটেছে। পরশু আমাকে যেতে হবে গুজরানওয়ালায়।"

"এটাও ঠাট্টা নাকি। মেয়েমানুষকে দয়া করবেন।"

"ঠাট্টা নয়, আমার সতীর্থ অমূল্য আড্ডি ছিলেন সেখানকার ডাক্তার। বিশ-পঁচিশ বছর প্র্যাকটিস করেছেন। কিছু বিষয়সম্পত্তিও জমিয়েছেন। হঠাৎ বিধবা স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে রেখে মরেছেন হার্টফেল করে। দেনাপাওনা চুকিয়ে জমিজমা বেচে তাদের উদ্ধার করে আনতে হবে আমাকে। কতদিন লাগবে ঠিক জানি নে।"

"এর উপরে আর কথা নেই।"

"এ সংসারে কথা কিছুরই উপরে নেই সোহিনী। নির্ভয়ে বলো, যা হবেই তা হোক। যারা অদৃষ্ট মানে তারা ভুল করে না। আমরা সায়ান্টিস্টরাও বলি অনিবার্যের এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। যতক্ষণ কিছু করবার থাকে কারও, যখন কোনোমতেই পারবে না, বলো 'বাস্'।"

"আচ্ছা, তাই ভালো।"

"যে মজুমদারটির কথা বললুম, দলের মধ্যে সে ততবেশি মারাত্মক নয়। তাকে ওরা দলে টেনে রাখে মান বাঁচাবার জন্যে। আর-যাদের কথা শুনেছি, চাণক্যের মতে তাদের কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকলেও ভাবনার কারণ থেকে যায়। অ্যাটর্নি আছে বজ্রকুবিহারী, তাকে আশ্রয় করা আর অক্টোপাসকে জড়িয়ে ধরা একই কথা। ধনী বিধবার তপ্ত রক্ত এইসব লোক পছন্দ করে। খবরটা শুনে রাখো, যদি কিছু করবার থাকে কোরো। সবশেষে আমার ফিলজফিটা মনে রেখো।"

"দেখুন চৌধুরীমশায়, রেখে দিন ফিলজফি। মানব না আপনার অদৃষ্ট, মানব না আপনার কার্যকারণের অমোঘ বিধান, যদি আমার ল্যাবরেটরির 'পরে কারও হাত পড়ে। আমি পাঞ্জাবের মেয়ে, আমার হাতে ছুরি খেলে সহজে। আমি খুন করতে পারি তা সে আমার নিজের মেয়ে হোক, আমার জামাই-পদের উমেদার হোক।"

ওর শাড়ির নিচে ছিল কোমরবন্ধ লুকোনো। তার থেকে ধাঁ করে এক ছুরি বের করে আলোয় ঝলক খেলিয়ে দিয়ে গেল। বললে, "তিনি আমাকে বেছে নিয়েছিলেন— আমি বাঙ্গালির মেয়ে নই, ভালোবাসা নিয়ে কেবল চোখের জল ফেলে কান্নাকাটি করি নে। ভালোবাসার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, প্রাণ নিতেও পারি। আমার ল্যাবরেটরি আর আমার বুকের কলিজা, তার মাঝখানে রয়েছে এই ছুরি।"

চৌধুরী বললেন, "একসময়ে কবিতা লিখতে পারতুম, আজ আবার মনে হচ্ছে হয়তো পারি লিখতে।"

"কবিতা লিখতে হয় লিখবেন, কিন্তু আপনার ফিলজফি ফিরিয়ে নিন। যা না-মানবার তাকে আমি শেষপর্যন্ত মানব না। একলা দাঁড়িয়ে লড়ব। আর বুক ফুলিয়ে বলব, জিতবই। জিতবই, জিতবই।"

"ব্র্যাভো, আমি ফিরিয়ে নিলুম আমার ফিলজফিটা। এখন থেকে লাগাব ঢাকে চাঁটি তোমার জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে। আপাতত কিছুদিনের জন্যে বিদায় নিচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে না।"

আশ্চর্যের কথা এই— সোহিনীর চোখে জল ভরে এল। বললে, "কিছু মনে করবেন না।" জড়িয়ে ধরলে চৌধুরীর গলা। বললে, "সংসারে কোনও বন্ধনই টেকে না, এও মুহূর্তকালের জন্যে।"

বলেই গলা ছেড়ে দিয়ে পায়ের কাছে পড়ে সোহিনী অধ্যাপককে প্রণাম করলে।

১০

খবরের কাগজে যাকে বলে পরিস্থিতি সেটা হঠাৎ এসে পড়ে, আর আসে দল বেঁধে। জীবনের কাহিনী সুখে দুঃখে বিলম্বিত লয়ে চলে। শেষ অধ্যায়ে কোলিশন লাগে অকস্মাৎ, ভেঙেচুরে স্তব্ধ হয়ে যায়। বিধাতা তাঁর গল্প গড়েন ধীরে ধীরে, গল্প ভাঙেন এক ঘায়ে।

সোহিনীর আইমা থাকেন আম্বালায়। সোহিনী তার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছে, 'যদি দেখা করতে চাও শীঘ্র এসো'।

এই আইমা তার একমাত্র আত্মীয় যে বেঁচে আছে। এরই হাত থেকে নন্দকিশোর কিনে নিয়েছিলেন সোহিনীকে।

নীলাকে তার মা বললে, "তুমিও আমার সঙ্গে এসো।"

নীলা বললে, "সে তো কিছুতেই হতে পারে না।"

"কেন পারে না।"

"ওরা আমাকে অভিনন্দন দেবে তারই আয়োজন চলছে।"

"ওরা কারা।"

"জাগানী ক্লাবের মেম্বররা। ভয় পেয়ো না, খুব ভদ্র ক্লাব। মেম্বরদের নামের ফর্দ দেখলেই বুঝতে পারবে। খুবই বাছাই করা।"

"তোমাদের উদ্দেশ্য কী।"

"স্পষ্ট বলা শক্ত। উদ্দেশ্যটা নামের মধ্যেই আছে। এই নামের তলায় আধ্যাত্মিক সাহিত্যিক আর্টিস্টিক সব মানেই খুব গভীরভাবে লুকোনো আছে। নবকুমারবাবু খুব চমৎকার ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন। ওরা ঠিক করেছে তোমার কাছ থেকে চাঁদা নিতে আসবে।"

"কিন্তু চাঁদা দেখছি ওরা নিয়ে শেষ করেছে। তুমি ঘোলো-আনাই পড়েছ ওর হাতে। কিন্তু এই পর্যন্তই। আমার যেটা ত্যাজ্য সেটাই ওরা পেয়েছে। আমার কাছ থেকে আর কিছু পাবার নেই।"

"মা, এত রাগ করছ কেন। ওঁরা নিঃস্বার্থভাবে দেশের উপকার করতে চান।"

"আচ্ছা, সে আলোচনা থাক্। এতক্ষণে তুমি বোধহয় তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে খবর পেয়েছ যে তুমি স্বাধীন।"

" হ্যাঁ পেয়েছি।"

"নিঃস্বার্থরা তোমাকে জানিয়েছেন যে তোমার স্বামীর দত্ত অংশে তোমার যে-টাকা আছে সে তুমি যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারো।"

" হাঁ জেনেছি।"

"আমার কানে এসেছে উইলের প্রোবেট নেবার জন্যে তোমরা প্রস্তুত হচ্ছ। কথাটা বোধহয় সত্যি?"

" হ্যাঁ সত্যি। বজকুবাবু আমার সোলিসিটর।"

"তিনি তোমাকে আরও কিছু আশা এবং মন্ত্রণা দিয়েছেন।"

নীলা চুপ করে রইল।

"তোমার বজকুবাবুকে আমি সিধে করে দেব যদি আমার সীমানায় তিনি পা বাড়ান। আইনে না পারি বে-আইনে। ফেরবার সময় আমি পেশোয়ার হয়ে আসব। আমার ল্যাবরেটরি রইল দিনরাত্রি চারজন শিখ সিপাইয়ের পাহারায়। আর যাবার সময় এই তোমাকে দেখিয়ে যাচ্ছি— আমি পাঞ্জাবের মেয়ে।"

বলে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ছুরি বের করে বললে, "এ ছুরি না চেনে আমার মেয়েকে, না চেনে আমার মেয়ের সোলিসিটরকে। এর স্মৃতি রইল তোমার জিম্মায়। ফিরে এসে যদি হিসেব নেবার হয় তো হিসেব নেব।"

১১

ল্যাবরেটরির চারদিকে অনেকখানি জমি ফাঁকা আছে। কাঁপন বা শব্দ যাতে যথাসম্ভব কাজের মাঝখানে না-পৌঁছয়। এই নিস্তব্ধতা কাজের অভিনিবেশে রেবতীকে সহায়তা করে। তাই ও প্রায়ই এখানে রাত্রে কাজ করতে আসে।

নিচের ঘড়িতে দুটো বাজল। মুহূর্তের জন্য রেবতী তার চিন্তার বিষয় ভাবছিল জানালার বাইরে আকাশের দিকে চোখ মেলে।

এমন সময়ে দেওয়ালে পড়ল ছায়া। চেয়ে দেখে ঘরের মধ্যে এসেছে নীলা। রাত-কাপড় পরা, পাতলা সিল্কের শেমিজ। ও চমকে চৌকি থেকে উঠে পড়তে যাচ্ছিল। নীলা এসে ওর কোলের উপর বসে গলা জড়িয়ে ধরল। রেবতীর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল, বুক উঠতে পড়তে লাগল প্রবলবেগে। গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগল, "তুমি যাও, এ ঘর থেকে তুমি যাও।"

ও বললে, "কেন।"

রেবতী বললে, "আমি সহ্য করতে পারছি নে। কেন এলে তুমি এ ঘরে।"

নীলা ওকে আরও দৃঢ়বলে চেপে ধরে বললে, "কেন, আমাকে কি তুমি ভালোবাসো না।"

রেবতী বললে, "বাসি, বাসি, বাসি! কিন্তু এ ঘর থেকে তুমি যাও।"

হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল পাঞ্জাবী প্রহরী; ভর্ৎসনার কণ্ঠে বললে, "মায়িজি, বহুত শরমকি বাৎ হ্যায়, আপ বাহার চলা যাইয়ে।"

রেবতী চেতনমনের অগোচরে ইলেকট্রিক ডাকঘড়িতে কখন্ চাপ দিয়েছিল।

পাঞ্জাবী রেবতীকে বললে, "বাবুজি, বেইমানি মৎ কারও।"

রেবতী নীলাকে জোর করে ঠেলে দিয়ে চৌকি থেকে উঠে পড়ল। দারোয়ান ফের নীলাকে বললে, "আপ বাহার চলা যাইয়ে, নহি তো মনিবকো হুকুম তামিল করে গা।"

অর্থাৎ জোর করে অপমান করে বের করে দেব। বাইরে যেতে যেতে নীলা বললে, "শুনছেন স্যার আইজাক নিউটন? কাল আমাদের বাড়িতে আপনার চায়ের নেমন্তন্ন ঠিক চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময়। শুনতে পাচ্ছেন না? অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন?"

বলে একবার তার দিকে ফিরে দাঁড়ালে।

বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে উত্তর এল, "শুনেছি।"

রাত-কাপড়ের ভিতর থেকে নীলার নিখুঁত দেহের গঠন ভাস্করের মূর্তির মতো অপরূপ হয়ে ফুটে উঠল, রেবতী মুগ্ধচোখে না-দেখে থাকতে পারল না। নীলা চলে গেল। রেবতী টেবিলের উপর মুখ রেখে পড়ে রইল। এমন আশ্চর্য সৌন্দর্য সে কল্পনা করতে পারে না। একটা কোন্ বৈদ্যুতবর্ষণ প্রবেশ করেছে ওর শিরার মধ্যে, চকিত হয়ে বেড়াচ্ছে অগ্নিধারায়। হাতের মুঠো শক্ত করে রেবতী কেবলই নিজেকে বলাতে লাগল, কাল চায়ের নিমন্ত্রণে যাবে না। খুব শক্ত শপথ করবার চেষ্টা করতে চায়, মুখ দিয়ে বেরয় না। ব্লটিঙের উপর লিখল, 'যাব না, যাব না, যাব না।' হঠাৎ দেখলে তার টেবিলে একটা ঘন লাল রঙের রুমাল পড়ে আছে, কোণে নাম সেলাই করা 'নীলা'। মুখের উপর চেপে ধরল রুমাল, গন্ধে মগজ উঠল ভরে, একটা নেশা সিরসির করে ছড়িয়ে গেল সর্বাঙ্গে।

নীলা আবার ঘরের মধ্যে এল। বললে, "একটা কাজ আছে ভুলে গিয়েছিলুম।"

দরোয়ান রুখতে গেল। নীলা বললে, "ভয় নেই তোমার, চুরি করতে আসিনি। একটা কেবল সই চাই। জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট করব তোমাকে, তোমার নাম আছে দেশজুড়ে।"

অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে রেবতী বললে, "ও ক্লাবের আমি তো কিছুই জানি নে।"

"কিছুই তো জানবার দরকার নেই। এইটুকু জানলেই হবে ব্রজেন্দ্রবাবু এই ক্লাবের পেট্রন।"

"আমি তো ব্রজেন্দ্রবাবুকে জানি নে।"

"এইটুকু জানলেই হবে মেট্রপলিটান ব্যাঙ্কের তিনি ডাইরেক্টর। লক্ষ্মী আমার, জাদু আমার, একটা সই বই তো নয়।"

বলে ডান হাত দিয়ে তার কাঁধ ঘিরে তার হাতটা ধরে বললে, "সই কারো।"

সে স্বপ্নাবিষ্টের মতো সই করে দিলে।

কাগজটা নিয়ে নীলা যখন মুড়ছে দরোয়ান বললে, "এ কাগজ আমাকে দেখতে হবে।"

নীলা বললে, "এ তো তুমি বুঝতে পারবে না।"

দরোয়ান বললে, "দরকার নেই বোঝবার।" বলে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে। বললে, "দলিল বানাতে হয় বাইরে গিয়ে বানিয়ো। এখানে নয়।"

রেবতী মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দরোয়ান নীলাকে বললে, "মাজি, এখন চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি গে।"

বলে তাকে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার ঘরে ঢুকল পাঞ্জাবী। বললে, "চারদিকে আমি দরজা বন্ধ করে রাখি, তুমি ওকে ভিতর থেকে খুলে দিয়েছ।"

এ কী সন্দেহ, কী অপমান! বারবার করে বললে, "আমি খুলিনি।"

"তবে ও কী করে ঘরে এল।"

সেও তো বটে। বিজ্ঞানী তখন সন্ধান করে বেড়াতে লাগল ঘরে ঘরে। অবশেষে দেখলে রাস্তার ধারের একটা বড় জানলা ভিতর থেকে আগল দেওয়া ছিল, কে সেই আগলটা দিনের বেলায় একসময়ে খুলে রেখে গেছে।

রেবতীর যে ধূর্তবুদ্ধি আছে এতটা শ্রদ্ধা তার প্রতি দরোয়ানজির ছিল না। বোকা মানুষ, পড়াশুনো করে— এই পর্যন্ত তার তাকত। অবশেষে কপাল চাপড়ে বলে, "আওরত! এ শয়তানি বিধিদত্ত।"

যে অল্প-একটু রাত বাকি ছিল রেবতী নিজেকে বারবার করে বলালে, চায়ের নিমন্ত্রণে যাবে না।

কাক ডেকে উঠল। রেবতী চলে গেল বাড়িতে।

১২

পরের দিন সময়ের একটু ব্যতিক্রম হল না। চায়ের সভায় চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটেই রেবতী গিয়ে হাজির। ভেবেছিল এ সভা নিভৃতে দুজনকে নিয়ে।

ফ্যাশনেবল সাজ ওর দখলে নেই। প'রে এসেছে জামা আর ধুতি, ধোবার বাড়ি থেকে নতুন কাচিয়ে আনা, আর কাঁধে ঝুলছে একটা পাট-করা চাদর। এসে দেখে সভা বসেছে বাগানে। অজানা শৌখিন লোকের ভিড়। দমে গেল ওর সমস্ত মনটা, কোথাও লুকোতে পারলে বাঁচে। একটা কোণ নিয়ে বসবার চেষ্টা করতেই সবাই উঠে পড়ল। বললে, "আসুন আসুন ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনার আসন এইখানে।"

একটা পিঠ-উঁচু মখমলে-মোড়া চৌকি, মণ্ডলীর ঠিক মাঝখানেই। বুঝতে পারলে সমস্ত জনতার প্রধান লক্ষ্যই ও। নীলা এসে ওর গলায় মালা পরিয়ে দিলে, কপালে দিলে চন্দনের ফোঁটা। ব্রজেন্দ্রবাবু প্রস্তাব করলেন ওকে জাগানী সভার সভাপতি পদে বরণ করা হোক। সমর্থন করলেন বঙ্কুবাবু, চারিদিকে করতালির ধ্বনি উঠল। সাহিত্যিক হরিদাসবাবু ডক্টর ভট্টাচার্যের ইন্টারন্যাশনাল খ্যাতির কথা ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, "রেবতীবাবুর নামের পালে হাওয়া লাগিয়ে আমাদের জাগানী ক্লাবের তরণী খেয়া দেবে পশ্চিম-মহাসমুদ্রের ঘাটে ঘাটে।"

সভার ব্যবস্থাপকেরা রিপোর্টারদের কানে কানে গিয়ে বললে, "উপমাগুলোর কোনোটা যেন রিপোর্ট থেকে বাদ না যায়।"

বক্তারা একে একে উঠে যখন বলতে লাগল 'এতদিন পরে ডক্টর ভট্টাচার্য সায়ান্সের জয়তিলক ভারতমাতার কপালে পরিয়ে দিলেন', রেবতীর বুকটা ফুলে উঠল— নিজেকে প্রকাশমান দেখলে সভ্যজগতের মধ্যগগনে। জাগানী সভা সম্বন্ধে যে-সমস্ত দাগী রকমের জনশ্রুতি শুনেছিল মনে-মনে তার প্রতিবাদ করলে। হরিদাসবাবু যখন বললে, 'রেবতীবাবুর নামের কবচ রক্ষাকবচরূপে এ সভার গলায় আজ ঝোলানো হল, এর থেকে বোঝা যাবে এ সভার উদ্দেশ্য কত মহোচ্চ', তখন রেবতী নিজের নামের গৌরব ও দায়িত্ব খুব প্রবলরূপে অনুভব করলে। ওর মন থেকে সংকোচের খোলসটা খসে পড়ে গেল। মেয়েরা মুখের থেকে সিগারেট নামিয়ে ঝুঁকে পড়ল ওর চৌকির উপর, মধুর হাস্যে বললে, "বিরক্ত করছি আপনাকে, কিন্তু একটা অটোগ্রাফ দিতেই হবে।"

রেবতীর মনে হল— এতদিন সে যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিল, স্বপ্নের গুটি গেছে খুলে, প্রজাপতি বেরিয়ে পড়েছে।

একে একে লোক বিদায় হল। নীলা রেবতীর হাত চেপে ধরে বললে, "আপনি কিন্তু যাবেন না।"

জ্বালাময় মদ ঢেলে দিলে ওর শিরার মধ্যে।

দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে, লতাবিতানের মধ্যে সবুজ প্রদোষের অন্ধকার।

বেঞ্চির উপরে দুজনে কাছাকাছি বসল। নিজের হাতের উপরে রেবতীর হাত তুলে নিয়ে নীলা বললে, "ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনি পুরুষমানুষ হয়ে মেয়েদের অত ভয় করেন কেন।"

রেবতী স্পর্ধাভরে বললে, "ভয় করি? কখনও না।"

"আমার মাকে আপনি ভয় করেন না?"

"ভয় কেন করব, শ্রদ্ধা করি।"

"আমাকে?"

"নিশ্চয় ভয় করি।"

"সেটা ভালো খবর। মা বলেছেন, কিছুতে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না। তা হলে আমি আত্মহত্যা করব।"

"কোনও বাধা আমি মানব না, আমাদের বিয়ে হবেই হবে।"

কাঁধের উপর মাথা রেখে নীলা বললে, "তুমি হয়তো জানো না তোমাকে কতখানি চাই।"

নীলার মাথাটা আরও বুকের কাছে টেনে নিয়ে রেবতী বললে, "তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে এমন কোনও শক্তি নেই।"

"জাত?"

"ভাসিয়ে দেব জাত।"

"তা হলে রেজিস্ট্রারের কাছে কালই নোটিশ দিতে হবে।"

"কালই দেব, নিশ্চয় দেব।"

রেবতী পুরুষের তেজ দেখাতে শুরু করেছে।

পরিণামটা দ্রুতবেগে ঘনিয়ে আসতে লাগল।

আইমার পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মৃত্যুর আশঙ্কা আসন্ন। যে পর্যন্ত মৃত্যু না হয় সোহিনীকে তিনি কিছুতে ছাড়বেন না। এই সুযোগটাকে দুহাত দিয়ে আঁকড়িয়ে ধরে নীলার উন্মত্ত যৌবন আলোড়িত হয়ে উঠেছে।

পাণ্ডিত্যের চাপে রেবতীর পৌরুষের স্বাদ ফিকে হয়ে গেছে— তাকে নীলার যথেষ্ট পছন্দ নয়। কিন্তু ওকে বিবাহ করা নিরাপদ, বিবাহোত্তর উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দেবার জোর তার নেই। শুধু তাই নয়, ল্যাবরেটরির সঙ্গে যে লোভের বিষয় জড়ানো আছে তার পরিমাণ প্রভূত। ওর হিতৈষীরা বলে ল্যাবরেটরির ভার নেবার যোগ্যতর পাত্র কোথাও মিলবে না রেবতীর চেয়ে; সোহিনী কিছুতে ওকে হাতছাড়া করবে না, এই হচ্ছে বুদ্ধিমানদের অনুমান।

এদিকে সহযোগীদের ধিক্কার শিরোধার্য করে রেবতী জাগানী ক্লাবের অধ্যক্ষতার সংবাদ ঘোষণা করতে দিলে সংবাদপত্রে। নীলা যখন বলত 'ভয় লাগছে বুঝি', ও বলত 'আমি কেয়ার

করি নে'। ওর পৌরুষ সম্বন্ধে সংশয়মাত্র না থাকে এই জেদ ওকে পেয়ে বসল। বললে— 'এডিংটনের সঙ্গে চিঠিপত্র আমার চলে, একদিন এই ক্লাবে আমি তাঁকে নিমন্ত্রণ করে আনব'। ক্লাবের মেম্বররা বললে 'ধন্য'।

রেবতীর আসল কাজ গেছে বন্ধ হয়ে। ছিন্ন হয়ে গেছে ওর সমস্ত চিন্তাসূত্র। মন কেবলই অপেক্ষা করছে নীলা কখন আসবে, হঠাৎ পিছন থেকে ধরবে ওর চোখ টিপে। চৌকির হাতার উপর বসে বাঁ হাতে ধরবে ওর গলা জড়িয়ে। নিজেকে এই বলে আশ্বাস দিচ্ছে, ওর কাজটা যে বাধা পেয়েছে সেটা ক্ষণিক, একটু সুস্থির হলেই ভাঙার মুখে আবার জোড়া লাগবে। সুস্থির হবার লক্ষণ আশু দেখা যাচ্ছে না। ওর কাজের ক্ষতিতে পৃথিবীর কোনও ক্ষতি হচ্ছে নীলার মনের এককোণেও সে শঙ্কা নেই, সমস্তটাকে সে প্রহসন মনে করে।

দিনের পর দিন জাল কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছে। জাগানী সভা ওকে ছেঁকে ধরেছে, ওকে ঘোরতর পুরুষমানুষ বানিয়ে তুলছে। এখনও অকথ্য মুখ থেকে বেরয় না, কিন্তু অশ্রাব্য শুনলে জোর করে হাসতে থাকে। ডক্টর ভট্টাচার্য ওদের খুব একটা মজার জিনিস হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে রেবতীকে ঈর্ষায় কামড়িয়ে ধরে। ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরের মুখের চুরট থেকে নীলা চুরট ধরায়। এর নকল করা রেবতীর অসাধ্য। চুরটের ধোঁয়া গলায় গেলে ওর মাথা ঘুরে পড়ে, কিন্তু এই দৃশ্যটা ওর শরীর মনকে আরও অসুস্থ করে তোলে। তা ছাড়া নানা রকমের ঠেলাঠেলি টানাটানি যখন চলতে থাকে, ও আপত্তি না জানিয়ে থাকতে পারে না। নীলা বলে, 'এই দেহটার 'পরে আমাদের তো কোনও মোহ নেই, আমাদের কাছে এর দাম কিসের— আসল দামি জিনিস ভালোবাসা, সেটা কি বিলিয়ে ছড়িয়ে দিতে পারি!' বলে চেপে ধরে রেবতীর হাত। রেবতী তখন অন্যদের অভাজন বলেই মনে করে, ভাবে ওরা ছোবড়া নিয়েই খুশি, শাঁসটা পেল না।

ল্যাবরেটরির দ্বারে বাইরে দিনরাত পাহারা চলছে, ভিতরে ভাঙা কাজ পড়ে রয়েছে, কারও দেখা নেই।

১৩

ড্রয়িংরুমে সোফায় পা দুটো তুলে কুশনে হেলান দিয়ে নীলা। মেঝের উপরে নীলার পায়ের কাছে ঠেস দিয়ে বসে আছে রেবতী, হাতে রয়েছে লেখন-ভরা ফুলস্ক্যাপ।

রেবতী মাথা নেড়ে বললে, "ভাষায় কেমন যেন বেশি রঙ ফলানো হয়েছে, এতটা বাড়িয়ে-বলা লেখা পড়তে লজ্জা করবে আমার।"

"ভাষার তুমি মস্ত সমঝদার কিনা। এ তো কেমিস্ট্রি ফরমুলা নয়— খুঁতখুঁত কোরো না, মুখস্থ করে যাও। জানো এটা লিখেছেন আমাদের সাহিত্যিক প্রমদারঞ্জনবাবু?"

"ঐসব মস্ত মস্ত সেন্টেন্স আর বড় বড় শব্দগুলো মুখস্থ করা আমার পক্ষে ভারি শক্ত হবে।"

"ভারি তো শক্ত। তোমার কানের কাছে আউড়ে আউড়ে আমার তো সমস্তটা মুখস্থ হয়ে গেছে— 'আমার জীবনের সর্বোত্তম শুভ মুহূর্তে জাগানী সভা আমাকে যে অমরাবতীর মন্দারমাল্যে সমলংকৃত করিলেন'— গ্র্যান্ড। তোমার ভয় নেই, আমি তো তোমার কাছেই থাকব, আস্তে আস্তে তোমাকে বলে দেব।"

"আমি বাংলা সাহিত্য ভালো জানি নে, কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছে, সমস্ত লেখাটা যেন আমাকে ঠাট্টা করছে। ইংরেজিতে যদি বলতে দাও কত সহজ হয় । Dear friends, allow me to offer you my heartiest thanks for the honour you have conferred upon me on behalf of the Jagani Club— the Great Awakener ইত্যাদি। এমন দুটো সেন্টেন্‌স্ বললেই বাস্—"

"সে হচ্ছে না, তোমার মুখে বাংলা যে খুব মজার শোনাবে। ওই যেখানটাতে আছে— 'হে বাংলাদেশের তরুণসম্প্রদায়, হে স্বাতন্ত্র্যসঞ্চালনরথের সারথি, হে ছিন্ন-শৃঙ্খলপরিকীর্ণ পথের অগ্রণীবৃন্দ'— যাই বলো, ইংরেজিতে এ কি হবার জো আছে? তোমার মতো বিজ্ঞানবিশারদের মুখে শুনলে তরুণ বাংলা সাপের মতো ফণা দুলিয়ে নাচবে। এখনও সময় আছে আমি পড়িয়ে নিচ্ছি।"

গুরুভার দীর্ঘ দেহকে সিঁড়ির উপর দিয়ে সশব্দে বহন করে সাহেবি পোশাকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ব্রজেন্দ্র হালদার মচমচ শব্দে এসে উপস্থিত। বললে, "নাহ্ এ অসহ্য, যখনই আসি নীলিকে দখল করে বসে আছ। কাজ নেই, কর্ম নেই, নীলিকে তফাত করে রেখেছ আমাদের কাছ থেকে কাঁটাগাছের বেড়ার মতো।"

রেবতী সংকুচিত হয়ে বললে, "আজ আমার একটু বিশেষ কাজ আছে তাই—"

"কাজ তো আছে, সেই ভরসাতেই তো এসেছিলুম; আজ তুমি মেম্বরদের নেমন্তন্ন করেছ, ব্যস্ত থাকবে মনে করে আপিসে যাবার আগে আধঘণ্টাটাক সময় করে নিয়ে তাড়াতাড়ি এসেছি। এসেই শুনছি এখানেই উনি পড়েছেন কাজে বাঁধা। আশ্চর্য। কাজ না থাকলে এইখানেই ওঁর ছুটি, আবার কাজ থাকলে এইখানেই ওঁর কাজ। এমন নাছোড়বান্দার সঙ্গে আমরা কেজো লোকেরা পাল্লা দিই কী ক'রে। নীলি, is it fair?"

নীলা বললে, "ডক্টর ভটচাজের দোষ হচ্ছে, উনি আসল কথাটা জোর করে বলতে পারেন না। উনি কাজ আছে বলে এসেছেন এটা বাজে কথা, না এসে থাকতে পারেন না বলেই এসেছেন এটাই শোনাবার মতো কথা এবং সত্যিকথা। আমার সমস্ত সময় উনি দখল করেছেন ওঁর জেদের জোরে। এই তো ওঁর পৌরুষ। তোমাদের সবাইকে ওই বাঙালের কাছে হার মানতে হল।"

"আচ্ছা ভালো, তা হলে আমাদেরও পৌরুষ চালাতে হবে। এখন থেকে জাগানী ক্লাব-মেম্বররা নারীহরণের চর্চা শুরু করবে। জেগে উঠবে পৌরাণিক যুগ।"

নীলা বললে, "বেশ মজা লাগছে শুনতে। নারীহরণ, পাণিগ্রহণের চেয়ে ভালো। কিন্তু পদ্ধতিটা কী রকম।"

হালদার বললে, "দেখিয়ে দিতে পারি।"

"এখনই?"

"হ্যাঁ এখনই।"

বলেই সোফা থেকে নীলাকে আড়কোলা করে তুলে নিলে।

নীলা চিৎকার করে হেসে ওর গলা জড়িয়ে ধরলে।

রেবতীর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। ওর মুশকিল এই যে, অনুকরণ করবার কিম্বা বাধা দেবার মতো গায়ের জোর নেই। ওর বেশি করে রাগ হতে লাগল নীলার 'পরে, এইসব অসভ্য গোঁয়ারদের প্রশ্রয় দেয় কেন!

হালদার বললে, "গাড়ি তৈরি আছে। তোমাকে নিয়ে চললুম ডায়মন্ডহারবারে। আজ সন্ধের ভোজে ফিরিয়ে এনে দেব। ব্যাঙ্কে কাজ ছিল, সেটা যাক গে চুলোয়। একটা সৎকার্য করা হবে। ডাক্তার ভটচাজকে নির্জনে কাজ করবার সুবিধে করে দিচ্ছি। তোমার মতো অতবড় ব্যাঘাতকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভালো, এজন্যে উনি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন।"

রেবতী দেখলে, নীলার ছটফট করবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না, নিজেকে সে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে না, বেশ যেন আরামে ওর বক্ষ আশ্রয় করে রইল। ওর গলা জড়িয়ে রইল বিশেষ একটা আসক্তভাবে। যেতে যেতে বললে, "ভয় নেই বিজ্ঞানী সাহেব, এটা নারীহরণের রিহর্সলমাত্র— লঙ্কাপারে যাচ্ছি নে, ফিরে আসব তোমার নেমন্তন্নে।"

রেবতী ছিঁড়ে ফেললে সেই লেখাটা।

হালদারের বাহুর জোর এবং অসংকুচিত অধিকারবিস্তারের তুলনায় নিজের বিদ্যাভিমান ওর কাছে আজ বৃথা হয়ে গেল।

আজ সান্ধ্যভোজ একটা নামজাদা রেস্টোরাঁতে। নিমন্ত্রণকর্তা স্বয়ং রেবতী ভট্টাচার্য, তাঁর সম্মানিতা পার্শ্ববর্তিনী নীলা। সিনেমার বিখ্যাত নটী এসেছে গান গাইতে। টোস্ট প্রোপোজ করতে উঠেছে বঙ্কুবিহারী, গুণগান হচ্ছে রেবতীর আর তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে নীলার। মেয়েরা খুব জোরের সঙ্গে সিগারেট টানছে প্রমাণ করতে যে তারা সম্পূর্ণ মেয়ে নয়। প্রৌঢ়া মেয়েরা যৌবনের মুখোশ পরে ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে অট্টহাস্যে উচ্চকণ্ঠে পরস্পর গা-টেপাটিপিতে যুবতীদের ছাড়িয়ে যাবার জন্যে মাতামাতির ঘোড়দৌড় চালিয়েছে।

হঠাৎ ঘরে ঢুকল সোহিনী। স্তব্ধ হয়ে গেল ঘরসুদ্ধ সবাই। রেবতীর দিকে তাকিয়ে সোহিনী বললে, "চিনতে পারছি নে। ডক্টর ভট্টাচার্য বুঝি? খরচের টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলে, পাঠিয়ে দিয়েছি গেল শুক্রবারে; এই তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কিছু অকুলোন হচ্ছে না। এখন একবার উঠতে হচ্ছে, আজ রাত্রেই ল্যাবরেটরির ফর্দ অনুসারে জিনিসপত্র মিলিয়ে দেখব।"

"আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?"

"এতদিন অবিশ্বাস তো করিনি। কিন্তু লজ্জাশরম যদি থাকে বিশ্বাসরক্ষার কথা তুমি আর মুখে এনো না।"

রেবতী উঠতে যাচ্ছিল, নীলা তাকে কাপড় ধরে টেনে বসিয়ে দিলে। বললে, "আজ উনি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন, সকলে যান আগে, তার পরে উনি যাবেন।"

এর মধ্যে একটা নিষ্ঠুর ঠোকর ছিল। স্যার আইজাক মায়ের বড় পেয়ারের, ওর মতো এতবড় বিশ্বাসী আর কেউ নেই, তাই সকলকে ছাড়িয়ে ল্যাবরেটরির ভার ওর উপরেই। আরও একটু দেগে দেবার জন্যে বললে, "জানো মা? অতিথি আজ পঁয়ষট্টিজন, এ ঘরে সকলকে ধরেনি, এক দল আছে পাশের ঘরে— ওই শুনছ না হো হো লাগিয়েছে? মাথাপিছু পঁচিশ টাকা ধরে নেয়, মদ না-খেলেও মদের দাম ধরে দিতে হয়। খালি গেলাশের জরিমানা কম লাগল না। আর কেউ হলে মুখ চুপসে যেত। ওঁর দরাজ হাত দেখে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের তাক লেগে গেছে। সিনেমার গাইয়েকে কত দিতে হয়েছে জানো?— তার এক রাত্তিরের পাওনা চারশো টাকা।"

রেবতীর মনের ভিতরটা কাটা কইমাছের মতো ধড়ফড় করছে; শুকনো মুখে কথাটি নেই।

সোহিনী জিজ্ঞাসা করলে, "আজকের সমারোহটা কিসের জন্যে?"

"তা জানো না বুঝি? অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে তো বেরিয়ে গেছে, উনি জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, তারই সম্মানে এই ভোজ। লাইফ মেম্বরশিপের ছশো টাকা সুবিধেমতো পরে শুধে দেবেন।"

"সুবিধে বোধহয় শীঘ্র হবে না।"

রেবতীর মনটার মধ্যে স্টিমরোলার চলাচল করছিল।

সোহিনী তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তা হলে এখন তোমার ওঠবার সুবিধে হবে না?"

রেবতী নীলার মুখের দিকে তাকালে। তার কুটিল কটাক্ষের খোঁচায় পুরুষমানুষের অভিমান জেগে উঠল। বললে, "কেমন করে যাই, নিমন্ত্রিতেরা সব—"

সোহিনী বললে, "আচ্ছা, আমি ততক্ষণ এখানে বসে রইলুম। নাসেরউল্লা তুমি দরজার কাছে হাজির থাকো।"

নীলা বললে, "সে হতে পারবে না মা। আমাদের একটা গোপন পরামর্শ আছে, এখানে তোমার থাকা উচিত হবে না।"

"দেখ্ নীলা, চাতুরীর পালা তুই সবে শুরু করেছিস, এখনও আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবি নে। তোদের কিসের পরামর্শ সে খবর কি আমি পাইনি। বলে দিচ্ছি, তোদের সে পরামর্শের জন্যে আমারই থাকা সবচেয়ে দরকার।"

নীলা বললে, "তুমি কী শুনেছ কার কাছে।"

"খবর নেবার ফন্দি থাকে গর্তের সাপের মতো টাকার থলির মধ্যে। এখানে তিনজন আইনওয়ালা মিলে দলিলপত্র ঘেঁটে বের করতে চাও ল্যাবরেটরি-ফন্ডে কোনও ছিদ্র আছে কিনা। তাই নয় কি নীলু।"

নীলা বললে, "তা সত্যিকথা বলব। বাবার অতখানি টাকায় তাঁর মেয়ের কোনও শেয়ার থাকবে না, এটা অস্বাভাবিক। তাই সবাই সন্দেহ করে—"

সোহিনী চৌকি থেকে উঠে দাঁড়াল। বললে, "আসল সন্দেহের মূল আরও অনেক আগেকার দিনের। কে তোর বাপ, কার সম্পত্তির শেয়ার চাস। এমন লোকের তুই মেয়ে এ কথা মুখে আনতে তোর লজ্জা করে না?"

নীলা লাফিয়ে উঠে বললে, "কী বলছ মা।"

"সত্যিকথা বলছি। তাঁর কাছে কিছুই গোপন ছিল না, তিনি জানতেন সব। আমার কাছে যা পাবার তা তিনি সম্পূর্ণ পেয়েছেন, আজও পাবেন তা, আর-কিছু তিনি গ্রাহ্য করেননি।"

ব্যারিস্টর ঘোষ বললে, "আপনার মুখের কথা তো প্রমাণ নয়।"

"সে-তিনি জানতেন। সকল কথা খোলসা করে তিনি দলিল রেজিস্ট্রি করে গেছেন।"

"ওহে বঙ্কু, রাত হল যে, আর কেন। চলো।"

পেশোয়ারির ভঙ্গি দেখে পঁয়ষট্টি জন অন্তর্ধান করলে।

এমন সময় সুটকেস হাতে এসে উপস্থিত চৌধুরী। বললেন, "তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে আসতে হল।— কী রে রেবি, বেবি, মুখখানা যে পার্চমেন্টের মতো শাদা হয়ে গেছে।— ওরে, খোকার দুধের বাটি গেল কোথায়।"

নীলাকে দেখিয়ে সোহিনী বললে, "যিনি জোগাবেন তিনি যে ওই বসে আছেন।"

"গয়লানীর ব্যবসা ধরেছ নাকি, মা।"

"গয়লা ধরার ব্যবসা ধরেছে, ওই যে বসে আছে শিকারটি।"

"কে, আমাদের রেবি নাকি।"

"এইবার আমার মেয়ে আমার ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়েছে। আমি লোক চিনতে পারিনি; কিন্তু আমার মেয়ে ঠিক বুঝেছিল যে ল্যাবরেটরিতে গোয়ালঘর বসিয়ে দিয়েছিলুম— গোবরের কুণ্ডে আর-একটু হলেই ডুবত সমস্ত জিনিসটা।"

অধ্যাপক বললেন, "মা, তুমি এই জীবটিকে আবিষ্কার করেছ যখন, তখন এই গোষ্ঠবিহারীর ভার তোমাকেই নিতে হবে। ওর আর সবই আছে কেবল বুদ্ধি নেই, তুমি কাছে থাকলে তার অভাবটা টের পাওয়া যাবে না। বোকা পুরুষদের নাকে দড়ি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে বেড়ানো সহজ।"

নীলা বললে, "কী গো স্যার আইজাক নিউটন, রেজিস্ট্রি আপিসে নোটিশ তো দেওয়া হয়েছে, ফিরিয়ে নিতে চাও নাকি।"

বুক ফুলিয়ে রেবতী বললে, "মরে গেলেও না।"

"বিয়েটা হবে তা হলে অশুভ লগ্নে।"

"হবেই, নিশ্চয় হবে।"

সোহিনী বললে, " কিন্তু ল্যাবরেটরি থেকে শত হস্ত দূরে।"

অধ্যাপক বললেন, "মা নীলু, ও বোকা, কিন্তু অক্ষম নয়। ওর নেশাটা কেটে যাক, তার পরে ওর খোরাকের জন্যে বেশি ভাবতে হবে না।"

"স্যার আইজাক, তা হলে কিন্তু তোমার কাপড়চোপড়গুলো একটু ভদ্র রকমের বানাতে হবে, নইলে তোমার সামনে আমাকে আবার ঘোমটা ধরতে হবে।"

হঠাৎ আর-একটা ছায়া পড়ল দেয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "রেবি, চলে আয়।"

সুড়সুড় করে রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।

আশ্বিন ১৩৪৭

মনোজ বসু
রায়রায়ানের দেউল

ক্রোশ-দশেকের ভিতর গ্রাম নাই, দিগন্ত-বিস্তারী পাকসির বিল। চৈত্র-বৈশাখেও এখানে-সেখানে পানাভরা জল, খানিকটা-বা পাঁক— রাত্রে ওইসব জায়গায় আলেয়া জ্বলে। তখন মানুষজন কেহ ওদিকে যায় না, যাইবার উপায় থাকে না। সুপারিকাঠের ছোট ছোট নৌকা ও তালের ডোঙা গ্রামের কিনারে ফাঁকায় পড়িয়া পড়িয়া শুকায়।

বর্ষায় ভরা-বিলের আর-এক মূর্তি! শোলা কলমিলতা ও চেঁচো-ঘাস জাগিয়া ওঠে; ডোঙা ছুটাছুটি করে হাজারে হাজারে। এ অঞ্চলের লোকের হামেশাই কিল্লাবাড়ির গঞ্জে যাইতে হয়। বিল ঘুরিয়া অতদূর যাইতে হাঙ্গামা অনেক। বর্ষার সময়টা সোজা বিল পাড়ি দিয়া যাওয়ার বড় সুবিধা।

গ্রাম ছাড়াইয়া ক্রোশ-দুই আগাইলে দেখিতে পাইবে, অনেক দূরে জলের মধ্যে সবুজ সুউচ্চ দ্বীপের মতো খানিকটা। তার উপর বড় বড় তালের গাছ আকাশ ফুঁড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। আরও আগাইয়া দেখিবে ঝোপ-জঙ্গল, ঘরের মটকার মতো উঁচু মাটির স্তূপ, মানুষে নাগাল পায় না এমনি অজস্র নলবন বাতাসে বাজিতেছে। সামনে পিছনে ডাহিনে বাঁয়ে সাঁ-সাঁ করিয়া জল কাটিয়া ডোঙা ছুটিতেছে, ঠকঠক করিয়া কাঠের উপর লগির আওয়াজ— দ্রুত গমনশীল মানুষে মানুষে পলকের জন্য চোখাচোখি, কদাচিত দু-এক টুকরা আলাপন। নিঃশব্দতার অতলে কথার ধ্বনি ডুবাইয়া দেখিতে দেখিতে আরোহীগুলি মুহূর্ত-মধ্যে নলবনের ফাঁকে ফাঁকে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আস্তে ভাই, সামাল— পাথরে ডোঙার তলা ফাঁসবে।

তাইতো বটে! নূতন কেহ ডোঙা চালাইতে আসিলে এমন পাথর দেখিয়া চমকিয়া ওঠে।

পাহাড় নাকি?

না, রায়রায়ানের দেউল।

বিলের সেদিকটা একেবারে ফাঁকা, একগাছি ঘাসের আগাও নাই। কিন্তু ভোরের দিকে সেখানে গিয়া পড়িলে আর চোখ ফিরাইবার উপায় থাকে না। সাদা বেগুনি লাল রঙের শাপলাফুলের মধ্যে পথ হারাইয়া বিভ্রান্ত হইয়া যাইতে হয়। জলের মধ্যে বড় বড় পাথরে-খোদা ভাঙাচোরা কত মূর্তি— ময়ূরে সাপ ধরিয়াছে— ময়ূরের ঠোঁট আছে, পা নাই— পদ্মফুল— পাপড়িগুলি ভাঙিয়া থ্যাবড়া হইয়া গিয়াছে—হাত ও নাক ভাঙা উড়ন্ত অপ্সরী অল্প অল্প মাথা জাগাইয়া আছে।

আহা-হা, এমন দেউল ভাঙল কে গো?

রায়রায়ান নিজেই।

এই-যে ভাঙা দেউল, এখান হইতে অনেক অনেক দূরে একটি গ্রাম। সে গ্রামের নাম আজকালকার লোকে বলিতে পারে না। একদিন শেষরাতে সুন্দরীকাঠের ভরা আসিয়া লাগিল সেই গ্রামের ঘাটে। বর্ষার দুর্গম পথ, টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, বাতাস বহিতেছে। সকলে মানা করিল, রাতটুকু নৌকায় কাটাইয়া সকালবেলা বাড়ি যাইও। রামেশ্বর শুনিল না— সাত দিন আজ বাড়ি ছাড়া, ঘরে তরুণী বউ। আর মা-বাপ মরা ছোট বৈমাত্রেয় ভাইটি। যাবার বেলা বধূর চোখে জল দেখিয়াছিল, অনেক রকম আবদার ছিল তার। নৌকা খুলিয়া দিয়াও সেদিন রামেশ্বর ভাবিতেছিল— কাজ নাই এই কাঠের ব্যবসা করিতে গিয়া, নামিয়া যাই। ভাবনাকুল মনে ছপ-ছপ-ছপ-ছপ দাঁড় ফেলিয়া পুরা আটটি দিন ও সাত রাত্রি আগে তারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল।—

পিচ্ছিল পথে আছাড় খাইয়া জল-কাদা মাখিয়া অনেক দুঃখে অবশেষে রামেশ্বর বাড়ি আসিল। হঠাৎ চমকাইয়া দিবে এই মতলবে আগে কাহাকেও ডাকিল না, টিপিটিপি খোড়ো-ঘরের দাওয়ায় উঠিল। সবল দুটি বাহু দিয়া নড়বড়ে দরজায় দিবে এইবার প্রচণ্ড ঝাঁকি। ঘুম উড়িয়া গিয়া ঘরের মধ্যে উঠিবে ভয়ার্ত কোলাহল। তার পর বাহির হইতে পরিচিত উচ্চকণ্ঠের হাসি ফাটিয়া পড়িবে। তার পর দীপ জ্বলিবে। তার পর—

দরজায় ঘা দিতে রামেশ্বর হুমড়ি খাইয়া ঘরের ভিতর পড়িল। খোলা দরজা। কেহ নাই। বউকে আর কী বলিয়া ডাকিবে, অন্ধকারে ভাইটির নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, মধুকর, মধুকর! ...

সে রাত্রি কাটিয়া দিন আসিল। এবং মধুকরেরও খোঁজ হইল। জ্ঞাতি-সম্পর্কের এক খুড়া তাহাকে বাড়িতে লইয়া রাখিয়াছেন। খোঁজ হইল না কেবল বধূটির, যাবার দিন বড় কান্না কাঁদিয়া যে বিদায় দিয়াছিল। তার পর দু দিন ধরিয়া গ্রামের মঙ্গলার্থীরা দলের পর দল অফুরন্ত উৎসাহে রামেশ্বরকে সমবেদনা জানাইয়া যাইতে লাগিলেন। বড় অসহ্য হইল। আবার এক রাত্রিশেষে পাঁচ বছরের ভাইটির ঘুম ভাঙাইয়া রামেশ্বর তাহাকে কাঁধে তুলিল, দীর্ঘ লাঠিগাছটি লইয়া তারার অস্পষ্ট আলোকে সাঁকোর উপর দিয়া সে চোরের মতো গ্রাম-নদীটি পার হইয়া গেল। মনের ঘৃণায় দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

কুড়ি বছর পরে ঘোড়ায় চড়িয়া লোকজন সৈন্যসামন্ত লইয়া ফিরিয়া আসিলেন রায়রায়ান রামেশ্বর। আজমিরের এক বৃদ্ধ সেনানীর বুকে ছুরি মারিয়া ঘোড়াটি কাড়িয়া আনা। নাম তার কুণ্ডল, সে কী ঘোড়া! একতাল উঁচু, ছুটিবার সময় যেন বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলে। এই কুড়ি বছর রামেশ্বর ভাগ্যের সঙ্গে অবিরাম লড়াই করিয়াছেন, কপালের উপর বঙ্কিম বলিরেখায় অবোধ্য অক্ষরে সেইসব দিনের কত কী ভয়ংকর কাহিনী লেখা রহিয়াছে। রায়রায়ান জায়গির লইয়া আসিয়াছেন, সেই জায়গিরের দখল লইয়া প্রথমেই বাধিল ভরত রায়ের সঙ্গে।

ভদ্রার দক্ষিণপারে খালের মুখে ভরতগড়। কিল্লাবাড়ি হইতে ফৌজদারের কামান আনিয়া প্রাকারের ধারে বসানো হইয়াছে। প্রথম দু দিন খুব তোপ দাগা হইয়াছিল। এখন চুপচাপ। ভরত

রায়ের লোক প্রাকারের মুখ কাটিয়া দিয়াছে, গড়ের চারিদিক নদীর জলে কানায় কানায় ভর্তি। ভিতরে কী একটা কাণ্ড চলিয়াছে, কিন্তু বাহির হইতে তাহার একবিন্দু আঁচ পাইবার জো নাই।

সেদিন বড় অন্ধকার রাত্রি। রায়রায়ানের ঘুম নাই। শিবির হইতে খানিকটা দূরে ভদ্রার কূলে আপনার মনে পায়চারি করিতেছেন। হঠাৎ খস-খস-খস— রায়রায়ানের কান খাড়া হইয়া উঠিল, কেয়া-ঝাড়ের ভিতরে অতিশয় ক্ষীণ যৎসামান্য আওয়াজ। প্রবল জোয়ারের টান—তাহাতে যে ওই শব্দটুকু না হইতে পারে এমন নয়। রামেশ্বরের তবু সন্দেহ হইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিসারিত করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ঠিক! কেয়া-জঙ্গলের নিবিড় ছায়ার মধ্যে আগাগোড়া আবৃত করিয়া একখানা বজরা অতি চুপি-চুপি উজান ঠেলিয়া যাইতেছে। কাহাকেও ডাকিলেন না, নিজের বিপদের আশঙ্কা মনে হইল না, ওইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি আগাইতে লাগিলেন। পরিখার মুখে আসিয়া পথ আটকাইল। সেখান হইতে দেখিতে লাগিলেন— চোখ অন্ধকারে জ্বলিতে লাগিল— দেখিলেন, নৌকা নিঃশব্দে গড়ের পিছনে সংকীর্ণ নালার মুখে আসিয়া লাগিল। সঙ্গে সঙ্গেই কয়টি সাদা পুঁটলি নালায় গড়াইয়া আসিয়া নৌকায় পড়িল, আর চক্ষের পলক ফেলিতে-না-ফেলিতে নৌকা পাক খাইয়া সুতীব্র জলস্রোতে বিদ্যুতের বেগে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রায়রায়ান ছুটিতে ছুটিতে তাঁবুর দিকে ফিরিলেন। খানিকটা দূরে একটি কেওড়া-গুঁড়িতে ঠেস দিয়া মধুকর মৃদুস্বরে বাঁশি বাজাইতেছিল; বড় মধুর বাঁশি বাজায় সে। দ্রুত পদশব্দে চমকিয়া তাহার হাতের বাঁশি পড়িয়া গেল। নিঃশব্দে মধুকর দাদার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

চলো—

কোথায়?

রানায়ের মোহানায়।

রানায়ের মোহানা ক্রোশ পনেরো-ষোলো দূর। গাঙটা সেখানে চারিমুখ হইয়া গিয়াছে। ভরত রায়ের সঙ্গে দেবগঙ্গার চাকলাদারের সম্প্রীতি খুব বেশি। নৌকা যদি সেদিকে যায় তবে রানাই হইতে ডাইনে মোড় ঘুরিবে। স্থলপথে আগে গিয়া সেখানে ঘাঁটি দেওয়া দরকার।

মুহূর্তমধ্যে আটজন ঢালিসৈন্য প্রস্তুত হইয়া মাঠের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। অশান্ত কুণ্ডল মাটির উপর খুব দাপাইতে লাগিয়াছে। এতক্ষণে রায়রায়ানের মুখে হাসি ফুটিল। ঘোড়ার কাঁধে করাঘাত করিয়া বলিলেন, থাম্ থাম্ বেটা,— সবুর সয় না বুঝি! আচ্ছা, আমি চললাম আগে আগে, তোমরা এসো শিগগির—

মাঠ ভাঙিয়া কুণ্ডল ছুটিল। নদীকূলে ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া রামেশ্বর মোহানার মুখে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মধুকরেরা পৌঁছিল যখন কৃষ্ণাদশমীর চাঁদ দেখা দিয়াছে। নিষুপ্ত জেলেপাড়া, ঘাটে অগণিত ডিঙা বাঁধা। এক-একটা ডিঙার ছইয়ের মধ্যে সকলে প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। রাত্রি শেষ হইয়াছে, ঝাপসা-ঝাপসা জোছনা। সেই সময়ে জলের উপর বজরার ছায়ামূর্তি দেখা দিতেই— গুড়ুম!

বজরা হইতেও জবাব আসিল। তীরের উপর গাছে গাছে পাখিরা ত্রস্ত হইয়া কলরব শুরু করিয়াছে। অকস্মাৎ অনেকগুলি কণ্ঠের আর্তনাদ— ঝপঝপ শব্দে মাঝ-নদীর জল ছিটকাইয়া উঠিল— বজরা চরকির মতো পাক খাইতে লাগিল। রামেশ্বর তীব্র আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, হাসিল্!

দশটি ডিঙা সকল দিক হইতে বজরা ঘিরিয়া ধরিল। জল রক্তে রাঙা হইয়া গিয়াছে। একটি শবের কালো চুল জলের টানে একবার ভাসিয়া সেই মুহূর্তে অতলে তলাইয়া গেল। মাল্লা ক'জন গলুয়ে পড়িয়া কাতরাইতেছে। মধুকর লাফাইয়া ভিতরে ঢুকিল, ক্ষণপরে বাহির হইল ছোট একটি তোরঙ্গ লইয়া।

সমস্ত এই?

মধুকর বলিল, হ্যাঁ দাদা, তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি— আর কিচ্ছু নেই—এসো দিকি।

রামেশ্বরও ঢুকিতে যাইতেছিলেন, ইঙ্গিতে মধুকর নিরস্ত করিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, ওর মধ্যে রয়েছেন ভরত রায়ের স্ত্রী-কন্যা আর গড়ের আরও জন পাঁচ-সাত মেয়েলোক—

বজ্রকণ্ঠে রামেশ্বর বলিলেন, ডাক দেও পুরুষলোক যে আছে—

মধুকর বলিল, পুরুষ কেউ নেই। ভরতের মেজছেলে ওঁদের নিয়ে পালাচ্ছিলেন, তিনি ঘায়েল হয়ে ভেসে গেছেন। ভয়ে সকলে এখন মড়ার মতো। আপনি আর যাবেন না ওদিকে।

মুহূর্তকাল ভাবিয়া রায়রায়ান কূলে নামিয়া আসিলেন। একজনকে বলিলেন, খোল্ তো তোরঙ্গ। দেখি আমাদের ছোট রায় কী নিয়ে এলেন।

ডালা তুলিতেই মণিমুক্তা ঝকঝক করিয়া উঠিল। খুশিমুখে মধুকরের পিঠে থাবা দিয়া রামেশ্বর বলিলেন, বেশ, বেশ! এবারে তুমি নিজে রামনগর চলে যাও— তোরঙ্গসুদ্ধ দেওয়ানজির হাতে দাও গিয়ে— গড়ের কাজে টাকার অভাব আর হবে না।— আর এঁরা থাকবেন বন্দিশালায়— কোনও অসুবিধা না হয়, দেখবে—

মনের আনন্দে রামেশ্বর কুণ্ডলের পিঠে গিয়া বসিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার পূর্বেই রায়রায়ানের গোলায় ভরতগড় ধসিয়া চুরমার হইয়া গেল। সেদিক দিয়া না আসিল কোনও প্রতিবাদ, না পাওয়া গেল একটা মানুষের সাড়াশব্দ। অনেক কষ্টে পরিখা পার হইয়া সৈন্যেরা গড়ে ঢুকিয়া দেখে, যা ভাবা গিয়াছিল তা-ই— সকলে পলাইয়াছে, জিনিসপত্র কিছুই পড়িয়া নাই, বারুদখানায় পয়ঃপ্রণালী খুলিয়া খালের জল তোলা হইয়াছে, গড়ের শূন্য কক্ষগুলি খাঁ-খাঁ করিতেছে।

বিজয়োল্লাসে রামেশ্বর রামনগর ফিরিয়া চলিলেন।

নিজ নামে নগরের পত্তন মাত্র হইয়াছে, যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে কাজ বড়বেশি অগ্রসর হইতে পায় নাই। অসমাপ্ত চত্বরের প্রান্তে অতি-প্রাচীন একটা বকুলগাছ। শ্রান্ত রামেশ্বর অপরাহ্ণ বেলায় প্রাসাদকক্ষ হইতে নবনির্মিত নগরীর দিকে অলস দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন, অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, চত্বরের প্রান্তে বকুলের ছায়াচ্ছন্ন তলদেশে অপ্সরীর মতো লঘুগামিনী বড় রূপসী একটি মেয়ে। মধুকর কী কাজে সেইখানে আসিয়াছিল; রায়রায়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ওটি?

ভরত রায়ের মেয়ে।

রামেশ্বর ভাইয়ের দিকে তাকাইলেন, মুখের উপর দিয়া কৌতুক-হাস্য মৃদু খেলিয়া গেল। বলিলেন, বন্দিশালায় বন্দিদের রাখবার নিয়ম। এ কী করেছ?

কিন্তু নিয়ম হইলেও এ ছাড়া যে অন্য উপায় ছিল না, মধুকর প্রাণপণে তাহা বুঝাইতে লাগিল। কারণ বন্দিশালাটা ঠিক নিরাপদ নয়— তা ছাড়া সেখানে থাকার অসংখ্য অসুবিধা যে রাখাই চলে না—

রামেশ্বর তবু মৃদু হাসিতেছেন দেখিয়া আরও বিব্রতভাবে মধুকর বলিল, আপনি দেখেননি তাই। দেখতেন যদি— সে যে কী ভয়ানক কান্নাকাটি—

কান্নাকাটি? খুব ভয়ানক? রামেশ্বর সহসা সোজা হইয়া বসিলেন, মুখের কৌতুক-হাস্য নিভিল, চোখ জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। ম্লান অপরাহ্ণ-আলোয় রহস্যাচ্ছন্ন অর্ধসমাপ্ত বিস্তীর্ণ নগরী— পশ্চিমে মাঠের প্রান্তে রক্তিম আভা বিলের জলে ডগমগ করিতেছে— দূরে সীমাহীন নিবিড় অরণ্যশ্রেণী। বিশ বছর আগেকার একটি গরিব খোড়ো-ঘর অকস্মাৎ রায়রায়ানের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে বিদায়-যাত্রার আয়োজন, কথা নাই— নির্বাক বিদায়চিত্র। ঘাটে সুন্দরী-কাঠ আনিবার নৌকা প্রস্তুত হইয়া ডাকাডাকি করিতেছে, ঘরের মধ্যে একটি কথা নাই, চোখ ভরিয়া গৌর গালদুটি বাহিয়া জল আসে, মুছাইয়া দিলে তখনই আবার ভরা-চোখ— অফুরন্ত, বাধা দিয়া ঠেকাইবার জো নাই।— সহসা হা-হা-হা করিয়া যেন স্বপ্ন ভাঙিয়া রায়রায়ান হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভরত রায়ের মেয়েটা দেখতে কেমন মধুকর?

মুখ লাল করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া মধুকর কোনোপ্রকারে জবাব দিল, ভালো।

তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল। ভাইয়ের গমনপথের দিকে গভীর স্নেহে তাকাইয়া রায়রায়ান মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। কিশোর বয়সের ইহাদের এই পাগলামি মিঠা লাগে। মধুকর চলিয়া গেলেও অনেকক্ষণ হাসি পাইতে লাগিল।

প্রাঙ্গণের কাছাকাছি একদিন মেয়েটার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। সে একাকী দিক্‌প্রান্তে একাগ্র চোখে তাকাইয়া ছিল।

তুমি কে?

গম্ভীর কণ্ঠে মুখ ফিরাইয়া থতমত খাইয়া মেয়েটি বলিল, আমার নাম মঞ্জরী।

রায়রায়ান বলিলেন, তুমি তো ভরত রায়ের মেয়ে। শুনেছ বোধহয়, তোমাদের গড়ের ভিতর অবধি ঘুরে এসেছি। কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ, রায়মশায়ের দেখা পাইনি। বলতে পার, তিনি কোথায়?

আত্মগৌরবে রামেশ্বর যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, চুপ করে চোখ নিচু করে রইলে যে বড়! জবাব দাও। গরজ আমারই। বীরবরের ঠিকানাটা পেলে তোমাদের বোঝা নামিয়ে অব্যাহতি পাই। ভয় নেই গো— আমরা কেউ যাচ্ছি না। খালি তোমাদের পালকি করে পাঠাব।

নিষ্ঠুর বিদ্রূপে মঞ্জরীর চোখ জ্বালা করিয়া জল আসিল। সুন্দরীর চোখের জল বড় পরিতৃপ্তির সঙ্গে রায়রায়ান উপভোগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, রাগ কোরো না। ভাগ্যিস আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, না হলে কোথায় আশ্রয় পেতে বল দিকি?

ভদ্রার জলে।

কুমারী মুখ তুলিল। অশ্রুভরা চোখ যেন জ্বলিতেছে। বলিতে লাগিল, ভদ্রার জলে আশ্রয় হত রায়রায়ান, সে হত ভালো আশ্রয়। আগে তো বুঝতে পারিনি যে আপনি—

রামেশ্বর দীর্ঘকাল ধরিয়া হাসিতে লাগিলেন। ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, কিছুই বুঝতে পারনি? দেওর শুনে কী ভাবলে বল তো? ভাবলে, শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘোড়া-পালকি নিয়ে মানুষ এসেছে, পটকা ছুড়ছে— না?

মঞ্জরী বলিল, ভেবেছিলাম—জোলো ডাকাত। ঘুণাক্ষরে আপনাকে সন্দেহ হয়নি। তার পর চোখ মুছিয়া দৃপ্তকণ্ঠে কহিতে লাগিল, রায়রায়ান আপনার সমস্ত খবর দেশের লোক জানে। চিরকাল আপনাকে একঘরে হয়ে থাকতে হবে— ভেবেছেন কী! মিছামিছি এত জাঁক করে এইসব গড় করছেন। আপনার ওই গড়খাইয়ের জলে ডুবে মরা উচিত—

মেয়েটির দুঃসাহসে রায়রায়ান স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু তুচ্ছতম প্রতিপক্ষের সামনে হঠাৎ রাগ দেখাইবার ব্যক্তি তিনি নহেন। বরঞ্চ আঘাত–যে যথাস্থানে গিয়া বাজিয়াছে, তাহাতে বড় আনন্দ হইল। সহাস্য নেত্রে তেমনি চাহিয়া বলিলেন, বটে!

মঞ্জরী বলিতে লাগিল, এই জায়গির কেমন করে আপনি নিয়ে এসেছেন, লোকে সমস্ত জানে। চাকলাদারেরা আপনাকে ঘৃণা করে, তারা কোনোদিন আপনাকে দলে নেবে না। তারা সব চাকলা গড়েছে গায়ের জোরে, আমির–ওমরাহের ঘরে মেয়েদের ভেট পাঠিয়ে নয়।

ভালো, ভালো—বলিয়া মৃদু হাসিয়া নির্লিপ্তভাবে রামেশ্বর ফিরিয়া কয়েক পা গিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, সুন্দরী, তোমাকেও তবে একটা সুখবর দিয়ে যাই। আমির–ওমরাহ্‌দের ঘরে তুমিও যাবে; দুঃখ নেই, আমি কোনও পক্ষপাত করিনে।

অবনতমুখী পাষাণ–প্রতিমার ন্যায় মঞ্জরী শুনিতে লাগিল। রামেশ্বর বলিতে লাগিলেন, সুখে থাকবে। বুঝলে? আগামী বুধবার যেতে হবে— প্রস্তুত থেকো।

কিন্তু ওই মুখের কথাই। বুধবার তার পর দু–তিনটা দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু কোথায়–বা রামেশ্বর, আর কোথায় তাঁহার সেই যাওয়ার আয়োজন! মানুষ ও পশু পাশাপাশি খাটিয়া দিনের পর দিন নগর গড়িয়া তুলিতেছে। বড় বড় নৌকায় দেশ–বিদেশের কাঠপাথর আসিয়া জড়ো হইতেছে— সেই পাথর ভাঙার শব্দ, করাতে কাঠ চিরিবার শব্দ— আজ কোথায় নূতন একটা স্তম্ভ উঠিতেছে, এই কোন্‌দিকে কী একটা ধসিয়া পড়িল, লোকজন কাতারে কাতারে ছুটিতেছে— তাড়া খাইয়া আবার উল্টা দিকে ছুটিতে লাগিল।— দীর্ঘদিন কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া সন্ধ্যা হইয়া যায়, রাত্রির অন্ধকার গভীর হইতে গভীরতর হয়, তখন শত শত কামারশালায় জ্বলন্ত হাপরের পাশে হাতুড়ির ঘায়ে লোহার উপর আগুনের ফুলকি উড়িতে থাকে, হাতুড়ি বাজে ঠং–ঠং–ঠং—

দেওয়ান জীবনলালের উপর জায়গির ও গড় তৈরির সমস্ত ভার। তার তিলার্ধ বিশ্রাম নাই। জায়গিরের বিধিব্যবস্থা তবু কতক কতক হইয়াছে, কিন্তু গড়ের কাজ কবে যে মিটিবে, সে এক বিশ্বকর্মা ছাড়া আর কেহ বলিতে পারে না। রাত্রে শুইয়া শুইয়া জীবনলালের মাথায় নূতন নূতন মতলব জাগে। পরিখা খোঁড়া হইয়াছে— তার ওদিকে উঠিবে আকাশভেদী প্রাচীর, চারিদিকে চারিটি সিংহদরজা, দুর্গদ্বার হইতে চারিটি রাস্তা সোজা সিংহদরজা ফুঁড়িয়া পরিখার সেতুর উপর পৌঁছিবে। গভীর রাত্রি পর্যন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া জীবনলাল মতলব খাড়া করেন; দিনের কাজকর্মের শেষে প্রসন্নচোখে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখেন, সুন্দর সুবৃহৎ রাজধানী আকাশের নিচে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে।

নগরে ফিরিয়া কদিন অল্পকিছু বিশ্রাম লইয়া রায়রায়ানও এইসব কাজের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেছেন। খুব ভোরবেলা ঘড়াৎ করিয়া দরজা খুলিবার মুখে এক–একদিন একটু–আধটু

তাঁহার গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। বন্দিনীদের পাঠাইয়া দিবার তখনও কোনও উপায় হয় নাই। মধুকর তাঁহাদের তদারক করে, সমস্ত দিন সে প্রায় এইসব লইয়া থাকে। তার পর গভীর রাত্রে সকলে শুইয়া পড়িলে অনেকক্ষণ অবধি নির্জন অলিন্দে বসিয়া আপনার মনে বাঁশি বাজায়। সে সময়ে ঘুমভাঙা শয্যায় রামেশ্বরেরও এক-একদিন মনে হয়, তাঁহার বড় যত্নে বড় কঠিন শ্রমে গড়া নগরীর উপর মধুকরের বাঁশি নিষুপ্ত রাত্রে মাঠের দিগন্ত হইতে স্বপ্ন-কুহকিনীদের ডাকিয়া আনিতেছে।

একদিন নির্জনে রামেশ্বর হঠাৎ আসিয়া মঞ্জরীর সামনে দাঁড়াইলেন। শোনো—

সপ্রশ্নদৃষ্টিতে মঞ্জরী চাহিল। একমুহূর্ত থামিয়া রামেশ্বর বলিতে লাগিলেন, সেদিন আমার সম্বন্ধে তুমি মিথ্যা অভিযোগ করেছিলে। ওসব শত্রুদের রটনা।

এ কয়দিনে মঞ্জরী অনেক বুঝিয়াছে, চোখের জল একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছে। কৌতুক-চঞ্চল চোখদুটি নাচাইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল। বাধা দিয়া রামেশ্বর বলিয়া উঠিলেন, বিশ্বাস করলে কি-না, বলে যাও—

মঞ্জরী কহিল, ওই সাফাই-এর দরকার কী রায়রায়ান, আমি তো আপনার বিচারক নই—

রায়রায়ান বলিলেন, তুমি আমায় বিয়ে কর।

খিলখিল করিয়া মঞ্জরী হাসিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ চাপিয়াছিল, আর পারিল না।

ক্রুদ্ধ হইয়া রামেশ্বর বলিলেন, তোমাকে আজই দিল্লি পাঠাতে পারি— জানো? আর তার অর্থ কী, তা-ও বোধহয় বোঝাতে হবে না।

পারেন তা? বলিয়া চোখেমুখে হাসির দীপ্তি তুলিয়া তাঁহাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করিয়া প্রগল্‌ভা তরুণী চলিয়া গেল।

ইহার পর প্রায়ই দেখা হইতে লাগিল। দেখিলেই মঞ্জরী পলাইত। একদিন রামেশ্বর তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। তখনই ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, জোর করবার শক্তি আছে মঞ্জরী, কিন্তু মন তা চায় না। বলিতে বলিতে গলার স্বর ভারী হইয়া উঠিল, এ যেন সে লোক নয়— সজলকণ্ঠে রামেশ্বর বলিলেন, আমার জীবনের খবর তুমি জানো না— কিন্তু আর এই যুদ্ধবিগ্রহ ভালো লাগে না, এখন শান্তিতে একটুখানি মাথা গুঁজে থাকতে চাই।

মঞ্জরী শান্তভাবে শুনিতে লাগিল, পলাইবার চেষ্টা করিল না। রায়রায়ান বিশ বছরের কাহিনী বলিয়া চলিলেন। সমস্ত বলিয়া গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। ধীরে ধীরে মঞ্জরী চলিয়া গেল।

বিকালবেলা মঞ্জরী একখানা আয়না পাঠাইয়া দিল। সেইসঙ্গে ছোট্ট একটু চিঠি—

> তারপর-যে বিশ বৎসর কেটে গেছে, রায়রায়ান। যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, সম্ভবত আয়নায় চেহারা দেখবার ফুরসৎ হয়নি। তাই একটা আয়না পাঠিয়ে দিলাম।

চিঠি পড়িয়া রামেশ্বর অনেকক্ষণ গুম হইয়া রহিলেন। ভ্রূকুটি-ভীষণ মুখে শুধু বলিলেন, আচ্ছা!

ভরতগড়ের রানীর কানে পৌঁছিল, তাঁহার দুরন্ত মেয়ে রায়রায়ানের সঙ্গে একটা কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে। এবারে রায়রায়ানের প্রতিহিংসা। ইহা যে কী বস্তু— রামেশ্বর অল্পদিন দেশে আসিয়াছেন, তবু চাকলাদারের ঘরের শিশুটি অবধি তাহা বুঝিয়া ফেলিয়াছে। সকলের আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল। কিন্তু যাহাকে লইয়া এতবড় ব্যাপার, সে দিনরাত দিব্য হাসিয়া-খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া সেই চিঠি শতকুটি করিয়া ফেলিয়াও রায়রায়ানের রাগ মিটে না। তার পর একসময়ে সত্যসত্যই তিনি আয়না দেখিতে বসিলেন। কুড়ি বছর ভাগ্যের সঙ্গে নিদারুণ লড়াই হইয়াছে, সর্বাঙ্গে তার প্রতিটি আঘাতের চিহ্ন। সমস্ত মাথার মধ্যে একটি কালোচুল নাই, মুখের উপর যে-ছায়া পড়িয়াছে তাহা দেখিয়া নিজেরই প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া ওঠে, এ তরুণী ব্যঙ্গ করিবে ছাড়া আর কী! বিশ বছর আগে বেদনাবিদ্ধ যে যুবক গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তাহার একবিন্দু চেহারা আর খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। সাদাচুলের রাশি দুই হাতে ঢাকিয়া আয়নার সম্মুখে বসিয়া রামেশ্বর সেইসব দিনের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ সমস্ত রামনগর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পথে দুজন লোক একত্র হইলেই একটিমাত্র কথা। একজন সান্ত্রীকে হীরার আংটি বকশিশ দিয়া ভরতগড়ের রানী বৃত্তান্ত শুনিলেন। শুনিয়া বুকের রক্তে ফুল রাঙাইয়া শ্মশানকালীর পূজার জন্য গোপনে পাঠাইয়া দিলেন। ভরত রায় অগ্রবর্তী, সঙ্গে আরও চারিজন চাকলাদার— সকলে মিলিয়া রামনগর ধ্বংস করিতে আসিতেছেন। সৈন্য আসিয়া দুই ক্রোশের মধ্যে ঘাঁটি দিয়া বসিয়াছেন।

অলিন্দে সেদিন আর মধুকরের বাঁশি বাজিতেছে না, সেইখানে গুপ্তমন্ত্রণা বসিয়াছে। মধুকর শত্রুশিবির আক্রমণ করিতে চায়। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, আকাশে চাঁদ উঠে নাই। মধুকর জেদ ধরিয়াছে— এই আঁধারে আঁধারে নিঃসাড়ে দলবল লইয়া শত্রুশিবিরে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

রামেশ্বর মাথা নাড়িলেন। অসম্ভব, একেবারে অযৌক্তিক কথা। পাঁচ চাকলাদারের সমগ্র শক্তি সমবেত হইয়াছে, তার সামনে রায়রায়ানের নবনিযুক্ত ঢালীর দল কয়টি বানের মুখে কুটার মতো ভাসিয়া চলিয়া যাইবে।

পদশব্দ !— কে? এতক্ষণে দেওয়ান জীবনলাল আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জীবনলাল দৌত্যে গিয়াছিলেন, হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খবর বলিতে লাগিলেন, দেবগঙ্গার চাকলাদার বলিয়া পাঠাইয়াছেন, সকলের আগে ভরত রায়ের পুরমহিলাদের সসম্মানে পাঠাইয়া দিতে হইবে। তাঁরা গিয়া যদি বলেন, কোনও দুর্ব্যবহার হয় নাই, সন্ধির বিবেচনা তার পর—

মধুকর লাফাইয়া উঠিল, কাজ নেই দাদা, ওঁদের পাঠানো হবে না। আমি সর্দারদের ডাকি।

কিন্তু ইহা কাজের কথা নয়। রামেশ্বর ভাইকে শান্ত করিয়া বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, দেওয়ানজি, গড়ের বাকি কত?

জীবনলাল বলিল, শেষ হতে অন্তত আরও ছ-মাস। তখন পাঁচটা কেন, পঞ্চাশটা চাকলাদার এলেও পিছু হটব না। কিন্তু এখন যা বলে মেনে নিতে হবে।

মধুকর গর্জিয়া উঠিল, এই অপমান?

উপায় নেই। বলিয়া জীবনলাল ম্লান হাসিল। বলিল, চোখের সামনে এইসব ভেঙে ছারখার করবে— আমি বেঁচে থেকে দেখতে পারব না রায়রায়ান।

মধুকর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বেশ। কিন্তু হাঙ্গামার মধ্যে যাবার আগে গড়ের বন্দোবস্ত শেষ করে ফেলা উচিত ছিল না কি? ওরা আসবে— এ তো জানা কথা।

এবার রামেশ্বর কথা কহিলেন। বলিলেন, জানা কথা কী বলছ মধুকর, এ স্বপ্নেও ভাবা যায়নি। চাকলাদারেরা চিরদিন নিজেদের মধ্যে লাঠালাঠি করে আসছে। আজকেই কেবল এক হল। এরা মতলব করেছে, সুবে বাংলায় আর নতুন জায়গিরদার ঢুকতে দেবে না।

জীবনলাল কহিল, আর ভরত রায়ও নানা মিথ্যে রটনা করেছে। স্ত্রী-কন্যা বেইজ্জত হয়েছে বলে সকলের কাছে কেঁদে-কেঁদে বেড়িয়েছে।

মধুকর শেষ প্রস্তাব করিল, তবে আমরা পালাই। ভরতকে জব্দ করব। মেয়েদের নিয়ে ঢাকার দিকে চলে যাই।

জীবনলালের তাহাতেও মহা আপত্তি। কহিল, সে হয় না। তাহলে মানুষ না-পেয়ে আক্রোশ পড়বে রামনগরের উপর। সমস্ত শ্মশান হয়ে যাবে। এবারে সন্ধি হোক। আমি কথা দিচ্ছি ছোট রায়, ছ-মাস পরে দশগুণ শোধ তুলব।

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

আরও অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক জল্পনার পর রামেশ্বর সকালবেলায় শিবিকার ব্যবস্থা করিতে হুকুম দিলেন।

চত্বরের প্রান্তে বহুপ্রাচীন শাখাবহুল সেই বকুলগাছ— ফুল ঝরিয়া ঝরিয়া বাতাসকে গন্ধমন্থর করিতেছে। তাহারই ছায়াতলে দাঁড়াইয়া রায়রায়ান নিঃশব্দে বিদায়-যাত্রা দেখিতেছিলেন। সবুজ কিংখাবে মোড়া হাঙর-মুখো মাঝের ঝালরদার শিবিকাখানি— ওইটি মঞ্জরীর। রামেশ্বর একাকী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, হঠাৎ নূপুরের শব্দে পিছনে তাকাইলেন। মঞ্জরী রূপে-অলঙ্কারে বেশের পারিপাট্যে ঝলমল করিয়া আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

রায়রায়ানের মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল। ইহারা আজ বিজয়ী; তরুণীর মুখে-চোখে সেই অহঙ্কার যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। মৃদুস্বরে মঞ্জরী বলিল, যাচ্ছি—

রামেশ্বর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। মঞ্জরী বলিতে লাগিল, আপনাদের যত্নে বড় সুখে ছিলাম। আপনাদের আতিথ্যের কথা বাবাকে বলব।

স্বরটা রায়রায়ানের কাছে ব্যঙ্গের মতো ঠেকিল। রূঢ় স্বরে জবাব দিলেন, বেশ, বোলো— একটা কথাও বাদ দিও না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বলিতে লাগিলেন, আমার ইচ্ছে হচ্ছে কী— ডিঙায় করে তোমাদের ভদ্রার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে দিই তলা ফুটো করে। ছটফট করে ডুবে মরো। কিন্তু সে তো হবার জো নেই মধুকর আর জীবনলালের জ্বালায়—

সহসা মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, হয়তো বুঝিবার ভুল হইয়াছে— মঞ্জরী দুটি আয়ত চোখের গভীর দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। চোখের কোণে অশ্রু টলমল করিতেছে। ঝরঝর করিয়া সেই অশ্রু গণ্ড বাহিয়া ঝরিতে লাগিল। রামেশ্বর সেইদিকে চাহিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর ম্লান হাসিয়া বলিলেন, তুমি গিয়ে স্বচ্ছন্দে সব কথা বলতে পারো। এইসব অট্টালিকা জায়গির স্বপ্নের মতো এসেছে— আবার যদি চলে যায়, আমার কিছু ক্ষতি হবে না।

রাজকন্যা তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া রায়রায়ানের পদধূলি লইল। বলিল, আমি সমস্ত শুনেছি। এই রাজ্যপাট আপনার বীরত্বের ইনাম। ইচ্ছে হলে এর চতুর্গুণ এখনই আজকেই আবার আপনি তৈরি করতে পারেন।

রামেশ্বর ম্লান হাসিয়া মাথার পলিত কেশের উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন। বলিলেন, আর পারিনে। কুড়ি বছর পরে আয়নায় দেখলাম, সত্যিই বুড়ো হয়েছি। দেহে বল নেই, মনেও বল নেই। এখন এসব শেষ করে গরিবের ছেলে হয়ে আবার খোড়ো-ঘরে যেতে ইচ্ছে হয়। তোমায় আমি দিল্লি পাঠাচ্ছিলাম, আরও কত অত্যাচার হয়েছে হয়তো— আমার সমস্ত অপরাধ তোমার বাবাকে বোলো মঞ্জরী—

মঞ্জরী দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, মিথ্যা বলব কেন?

রামেশ্বর অবাক হইয়া চাহিলেন। মঞ্জরী বলিতে লাগিল, দিল্লিতে কখনও আপনি পাঠাতেন না, সে আমি জানি। আপনার মনের কথা সমস্ত জানি আমি। যাবার বেলায় তাই প্রণাম করতে এলাম।

বলিতে বলিতে সে থামিল। মুখের উপর এক ঝলক রক্ত নামিয়া আসিল। জোর করিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিতে লাগিল, বাবা এবার অনেক আয়োজন করে এসেছেন, আমি না গেলে অনর্থ হবে। আমি তাই ফিরে যাচ্ছি। আপনার রাজধানী গড় নাওয়ারা— সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে আমাকে নিয়ে আসবেন। তাই বলতে এলাম।

নিয়ে আসব? সম্মোহিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রামেশ্বর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, তুমি কি সত্যিকথা বলছ? আমি বুড়ো হয়ে গেছি, মন বড় দুর্বল মঞ্জরী—

মঞ্জরী রায়রায়ানের দুই পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল। অশক্ত বৃদ্ধ নয়— রণশ্রান্ত মহাবিজয়ী বীর তার সম্মুখে। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া অশ্রুভরা চোখে কুমারী হাসিল— ম্লান, কিন্তু বড় মধুর হাসি। বলিল, নিয়ে আসবেন। জন্মাষ্টমীর রাত্রে আমরা প্রতি বছর গড়ের বাইরে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে যাই। সঙ্গে জন-পঞ্চাশ মাত্র রক্ষী থাকে। এখনও তার ছ-সাত মাস দেরি। আপনি এর মধ্যে গড় শেষ করুন। কুণ্ডলকে নিয়ে যাবেন। আমি ভদ্রার কূলে কৃষ্ণচূড়ার তলায় অপেক্ষা করব— আপনি আর আপনার কুণ্ডল আমাকে উদ্ধার করবেন।

ঝুনঝুন নূপুর বাজাইয়া মঞ্জরী ধীরে ধীরে শিবিকায় গিয়া বসিল।

গড়ের কাজে পরদিন হইতে চতুর্গুণ লোক লাগানো হইল। পুরীর সামান্য কর্মচারীটি পর্যন্ত বুঝিয়াছে, রায়রায়ান প্রতিহিংসার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। জীবনলাল মহিলাদের পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিল, ফিরিতে রাত হইল। তার পর গভীর রাত্রে আগের দিনের মতো আবার গুপ্ত পরামর্শ। চাকলাদারেরা সসৈন্যে ফিরিয়া যাইতে রাজি হইয়াছেন; কিন্তু ভূষণার মধ্যে রামেশ্বরকে এই নূতন গড় গড়িতে দেওয়া হইবে না।

জীবনলালের পরামর্শ, ইসলামাবাদের দিকে গিয়া ফিরিঙ্গিদের শরণ লওয়া। সেখানে জায়গিরের বিলিব্যবস্থা করিতে বেগ পাইতে হয় না। বাদশাহের নিকট হইতে নূতন ফরমান আনিবার অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু রামেশ্বর ঘাড় নাড়িলেন। আর তাঁহার নূতন করিয়া ভাগ্য খুঁজিবার উৎসাহ নাই।

একদিন রামেশ্বর কিল্লাবাড়িতে ফৌজদারের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন। তার পর অনেকদিন ধরিয়া এই পরামর্শ চলিল। জীবনলাল ইতিমধ্যে ইসলামাবাদের দিকে চলিয়া গিয়াছে। গড়ের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ। অর্ধসমাপ্ত পরিখা ও নগর শ্মশানের মতো খাঁ-খাঁ করিতেছে।

পাকসির বিল ইদানীং মজিয়া গিয়াছে, চৈত্র-বৈশাখে প্রায় শুকাইয়া আসে। তখন দিগন্তব্যাপ্ত নিবিড়কৃষ্ণ অবিচ্ছিন্ন জলধারা ক্রোশের পর ক্রোশ তরঙ্গিত হইত। বড় শুকনার সময়ে গোটা বিশ-পঁচিশ চর মাত্র সীমাহারা বারিসমুদ্রের মাঝখানে অসহায়ের মতো মাথা উঁচু করিয়া থাকিত। বিলের কিনারা দিয়া কিল্লাবাড়ি যাইবার পথ। মাসাবধি পরে কুণ্ডলের পিঠে চড়িয়া একদিন রামেশ্বর ফিরিয়া আসিতেছিলেন। ফৌজদার শেষপর্যন্ত কোনও সুবিধাই

করিতে পারিলেন না। ফিরিবার পথে বিলের প্রান্তে আসিয়া বিদ্যুৎ-চমকের মতো একটি সঙ্কল্প হঠাৎ রামেশ্বরের মনে জাগিয়া উঠিল।

রামনগরবাসী এবং চাকলাদার মহলে রাষ্ট্র হইয়া গেল, পরাজিত অবমানিত রায়রায়ান মনোকষ্টে বিবাগী হইতে বসিয়াছেন, দিবারাত্রি অন্তঃপুরের মধ্যে শ্যামসুন্দরের উপাসনায় তিনি মাতিয়া থাকেন। তার পর অনেক দিন পরে একদিন কুণ্ডলের পিঠে রায়রায়ান বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহস্র প্রজা সমবেত হইয়াছে।

জীবনলালও সেইদিন ফিরিয়াছে। সে চুপি-চুপি বলিল, এসবে কাজ নেই প্রভু, ইসলামাবাদে চলুন—

পর্তুগিজদের সঙ্গে শর্ত হইয়া গিয়াছে; ইসলামাবাদে রাজ্যপত্তন করিতে আর গোল নাই। সেখান হইতে রাজ্য ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া একদিন ভূষণাকেও গ্রাস করিবে, জীবনলাল সেই স্বপ্নে মাতোয়ারা।

কিন্তু রামেশ্বর রাজি নহেন। নিরন্ন সর্বস্বহারা হইয়া পথে পথে ঘুরিতে হইয়াছে, বিনিদ্র কত রাত্রি অজানা প্রান্তরের মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে কাটিয়াছে, দিন মাস বৎসরগুলি দেহের উপর পদাঙ্ক আঁকিয়া দ্রুত পলাইয়া গিয়াছে। জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া নূতন করিয়া তিনি আর সংগ্রামে মাতিবেন না। হাসিয়া বলিলেন, জীবনলাল, ইসলামাবাদে তুমি রাজ্য কর। আমি ফরমান এনে দেব।

জীবনলাল জিভ কাটিয়া বলিল, প্রভু, আমার কাজ রাজ্য গড়া— রাজত্ব করা নয়।

তবে মধুকরকে নিয়ে যাও। সে দেশ অরাজক, মগ আর ফিরিঙ্গি ডাকাতদের মধ্যে আমি তিলার্ধ বিশ্রাম পাব না। আমি পাকসির বিলের মধ্যে দেউল গড়ে শেষ ক-টা দিন শান্তিতে থাকব।

কাছাকাছি পাঁচ-সাতটা সুদীর্ঘ চর, তাদের মাঝে অল্প অল্প জলকাদা। কুণ্ডলের পিঠে বল্লম উঁচু করিয়া রায়রায়ান। প্রথম যৌবনের দুর্ধর্ষ বিক্রম বুকের মধ্যে আবার নাচিয়া উঠিয়াছে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার সামনের দিকে তাকাইয়া রায়রায়ান মাটিতে বল্লম ছুড়িয়া মারিলেন। অমনি সারবন্দি হাজার কোদাল পড়িল— ঝপ্‌পাস্। সেই হাজার হাত হইল দিঘির উত্তরসীমা।

বল্লম তুলিয়া লইয়া রায়রায়ান তীরবেগে কুণ্ডলকে ছুটাইলেন। কুণ্ডল উড়িয়া চলিল। একদমে আধ-ক্রোশ গিয়া একলহমা ঘোড়া থামিল। রায়রায়ান বল্লম পুঁতিয়া রাখিয়া রামনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

হাজার হাজার কোদাল দিনের পর দিন পড়িতে লাগিল। অবশেষে পোঁতা বল্লমের গোড়ায় আসিয়া দিঘি কাটা শেষ হইল। মাটির স্তূপে আকাশভেদী পাহাড় হইয়াছে। দেশ-দেশান্তর হইতে বড় বড় পাথরের চাঁই আসিয়া জমিতে লাগিল। দিনরাত্রি সেই পাথর মাটিতে বসানো হইতেছে, পাথরের উপর পাথর বসাইয়া দ্রুত এক অতি বিচিত্র দেউল খচিত হইতেছে। কত স্তম্ভ, কত চূড়া, কত মনোহর কারুকার্য তাহার উপর! সমস্ত জীবনের সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডার উজাড় করিয়া রামেশ্বর পাকসির বিলের মধ্যে ঢালিতে লাগিলেন।

আকাশ আলো করে দাঁড়িয়েছে, চমৎকার! চমৎকার!

লোকে বলে, রায়রায়ানের সাধনপীঠ।

কোন্ দেবতার প্রতিষ্ঠা হবে?

কেহ বলিতে পারে না।

ক্ষান্তবর্ষণ মেঘান্ধকার ভাদ্র-অষ্টমীর সন্ধ্যাকালে রামেশ্বর যাত্রা করিলেন। মঞ্জরী ভুলে নাই— মন্দিরের লৌহসমৃদ্ধ সুদৃঢ় বেষ্টনীর বাহিরে কৃষ্ণচূড়ার তলে আঁচল ঝাঁপিয়া সে প্রতীক্ষা করিতেছিল, মুহূর্তে ঘোড়ায় চড়িয়া রায়রায়ানের পৃষ্ঠলগ্ন হইল। রক্ষীরা সচকিত হইয়া দেখিল, দস্যু কন্যাকে লইয়া পলাইতেছে। কড়কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া মুষলধারে জল নামিল।

কুণ্ডল তীরবেগে ছুটিল। কুণ্ডলের অনুসরণ করিয়া কে পারিবে? দেখিতে দেখিতে ঘোড়া নিখোঁজ হইয়া গেল।

রামনগর যখন পৌঁছিল তখন শেষরাত্রি। পিঠের উত্তরীয় খুলিয়া রামেশ্বর কুমারীর দেহবল্লরী ধীরে ধীরে বাহুতে ধরিয়া তুলিলেন। পদ্মের পাপড়ির মতো চক্ষুদুটি মুদিয়া মঞ্জরী ক্লান্তিতে এলাইয়া রহিয়াছে। মেঘভাঙা ক্ষীণ জোছনা আসিয়া পড়িয়াছে তাহার ঘুমন্ত মুখের উপর। গভীর স্নেহে মুহূর্তকাল রামেশ্বর সেই মুখের দিকে চাহিলেন, তার পর অতি সন্তর্পণে তাহাকে সুকোমল উষ্ণ শয্যার উপর শোয়াইয়া দিলেন।

মধুকরের ডাক পড়িল। আনন্দের প্লাবন রামেশ্বরের অন্তর ভরিয়া ছাপাইয়া বাহিরে আসিতেছে, পরাজয়ের সমস্ত গ্লানি নিঃশেষে ভাসিয়া গিয়াছে। রামেশ্বর বলিলেন, মঞ্জরী রইলেন। দিনের বেলায় নয়— কাল সন্ধ্যার পর আঁধারে আঁধারে বজরায় করে ওঁকে পৌঁছে দিও। আমি দেউলের দরজায় প্রতীক্ষা করব।

মধুকর বলিল, এখনই যাচ্ছেন কেন? আপনি বড় ক্লান্ত, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন।

রামেশ্বর কহিলেন, অবসর কোথা ভাই? এখনও মন্দিরের চূড়ায় সোনার কলসি বসানো হয়নি, কত কাজ বাকি! কাল দেবীর প্রতিষ্ঠা হবে। এর মধ্যে প্রস্তুত হতে হবে তো?

হাসিয়া তখনই তিনি রওনা হইয়া গেলেন।

দিঘির জল কাকচক্ষুর মতো টলমল করিতেছে; সকালের সোনার আলোয় দেউল জলের উপর ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নিশ্বাস ফেলিয়া রায়রায়ান অসমাপ্ত কাজটুকু সমাধা করিতে লাগিয়া গেলেন। লোকজন আর বেশি নাই, অনেকেই বিদায় হইয়া গিয়াছে। দেউলশীর্ষে সোনার কলসি বসানো হইল, সারচন্দনে সমস্ত প্রকোষ্ঠ অনুলিপ্ত করা হইল, সহস্র ঘৃতের দীপ সাজানো হইল— রাত্রে জ্বালা হইবে, ডিঙার পর ডিঙা ভরিয়া আসিতে লাগিল পাকসি বিলের সমস্ত পদ্মফুল।

এত ফুল?

রায়রায়ানের পূজায় লাগিবে।

রাত্রির দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। রায়রায়ানের গুপ্ত পূজা, সেজন্য সন্ধ্যার আগেই সমস্ত লোক দেউল হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর কেহ নাই। লোকালয় হইতে বহুদূরে প্রকাণ্ড বিলের নিঃশব্দ পাষাণপুরীর মাথায় অনন্ত তারকাশ্রেণি। কক্ষের দীপাবলি একের পর এক নিভিয়া আসিতেছে, হু হু করিয়া নৈশ-বাতাসে বিলের জল ছলছল করিয়া উঠিতেছে। রামেশ্বর ছুটিয়া জলের প্রান্তে গিয়া দাঁড়ান, বুঝি বজরা আসিয়া ভিড়িল। আবার মেঘ জমিয়া তারা ঢাকিয়া অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিতেছে। সহসা রামেশ্বরের মনে হইল, মরিয়া প্রেত

হইয়া তিনি যেন নির্জন দ্বীপভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন— কণ্ঠে ধ্বনি নাই, পদতলে মৃত্তিকা নাই, অন্ধকার ছাড়া দৃষ্টি করিবার বস্তুও কিছু নাই, প্রবল প্রবাহশীল অনন্ত বায়ুমণ্ডলে তিনি হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন। অন্তরাত্মা সত্য সত্যই তাঁহার কাঁপিয়া উঠিল, হা-হা-হা করিয়া অকস্মাৎ উদ্দাম হাসির সঙ্গে অমূলক ভয় ভাঙিতে চেষ্টা করিলেন। মনে হইল, দূরের মসিকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্য দিয়া জলরাশি উত্তাল তাড়নে ভেদ করিয়া দ্রুতবেগে কী যেন আগাইতেছে। দুই চক্ষের সমস্ত দৃষ্টিশক্তি পুঞ্জিত করিয়া অন্ধকারের দিকে নির্নিমেষ চোখে চাহিয়া অধীর কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, মধুকর ! মধুকর !

ফিরিয়া আসিয়া আবার দ্বারপ্রান্তে বসিলেন। দীপ নিবিয়া গিয়া অন্ধকারের মধ্যে বিশাল সৌধকক্ষ অপরূপ রহস্যাবৃত দেখাইতেছে। বাতাস উঠিয়াছে। ঝড়ের বাতাস নৈশ নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া নবনির্মিত দেউলের পাষাণ-প্রাচীরে আর্তক্রন্দন তুলিয়া দাপাদাপি করিতে লাগিল— শক্রমে রামেশ্বর কোন্ সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ বৃষ্টিসিক্ত শীতল হস্ত আসিয়া লাগিল বাহুর উপর। মুহূর্তে চমকিয়া জাগিয়া বলিলেন, এলি? চোখ মুছিয়া দেখিলেন, মধুকর নহে— জীবনলাল। জীবনলাল নমস্কার করিল। উঠিয়া বসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে রায়রায়ান বলিলেন, আবার ইসলামাবাদ গিয়েছিলে, না? কবে ফিরলে?

জীবনলাল বলিল, আজ। সেখানে সমস্ত ঠিক করে এসেছি। ছোটখাটো গড়ের পত্তন হয়েছে।

একটু বিরক্তির সঙ্গে রায়রায়ান বলিলেন, সে-কথা আমার সঙ্গে কেন দেওয়ানজি, ছোট রায়ের সঙ্গে বলো।

জীবনলাল আবার নমস্কার করিয়া বিনীত কণ্ঠে বলিল, তিনি চলে গেছেন সেখানে। আমি শুধু খবরটা দিতে এসেছি।

মঞ্জরী তা হলে তোমার সঙ্গে এলেন? ব্যস্ত হইয়া রামেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

জীবনলাল বলিল, না প্রভু, তিনিও স্বামীর সঙ্গে গেছেন। ছোট রায় সেই খবর দিতে আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

নিবিড় অন্ধকারে কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইলেন না। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, দুজনেই পাষাণমূর্তির মতো দাঁড়াইয়া। তার পর রায়রায়ান বসিলেন। হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন, মধুকর কী বলে পাঠাল?

তিনি বললেন, মঞ্জরী তাঁর বাগ্‌দত্তা বধূ— আট মাস আগে রামনগর প্রাসাদের অলিন্দে চন্দ্র-সূর্য সাক্ষি করে গোপনে তাঁদের মালাবদল হয়েছিল।

ভরত রায়ের কঠোর শাসন থেকে তাঁকে ছিনিয়ে আনা— আপনি আর আপনার কুণ্ডল ছাড়া জগতে আর কারও সাধ্য হত না। কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি আপনাকে প্রণাম পাঠিয়েছেন।

বেশ, বেশ ! বলিয়া বিল কাঁপাইয়া রামেশ্বর আবার হাসিয়া উঠিলেন। আর রানী মঞ্জরী— তিনি কিছু বললেন?

জীবনলাল বলিল, রানী বলে পাঠিয়েছেন, বাধ্য হয়েই তাঁকে আপনার সঙ্গে একটু ছলনা করতে হয়েছিল। আপনি তাঁকে ক্ষমা করবেন।

ভোর হইয়া গেলে জীবনলাল বিদায় লইতে আসিয়া দেখিল, রামেশ্বর জলের দিকে নিবিষ্ট মনে চাহিয়া আছেন। পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বলিলেন, জলে কেমন ছায়া পড়েছে দেখ। আমারও ছায়া পড়েছে— বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি, না?

কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, পাগলের মতো।

জীবনলাল বলিল, প্রভু, বিদায় দিন এবার— ইসলামাবাদ যাব।

এখনই?

হ্যাঁ। নতুন রাজ্য গড়ছি, অবসর নেই। আশীর্বাদ করুন রায়রায়ান, এবার যেন সফল হই।

রামেশ্বর গভীর কণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন। তার পর বলিলেন, আর একটা কাজ করে দিয়ে যাও দেওয়ান মশাই। যারা দেউল গড়তে এসেছিল, তারা রামনগরে এখনও পুরস্কারের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে। তাদের একবার এখানে পাঠিয়ে দিয়ে যাও— কাজ আরও বাকি আছে।

লোকজন আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল দেউল-চূড়ায় সোনার কলসি ঝকঝক করিতেছে, রামেশ্বর দেখাইয়া ইঙ্গিত করিলেন নামাইয়া আনিতে। কাল এমনি সময়ে কত কষ্টে কত কৌশলে কলসি ওখানে বসানো হইয়াছে, গাঁতি দিয়া খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া আবার তাহা খসাইয়া আনা হইল। কলসি উপুড় করিয়া তাহার উপর বসিয়া রামেশ্বর হুকুম দিলেন, ভাঙো দেউল।

রায়রায়ান প্রকৃতিস্থ নাই, সকলে বুঝিল। কেহ অগ্রসর হইল না। রামেশ্বর পুনরায় বজ্রকণ্ঠে হুকুম দিলেন। কয়েকজন রামনগরে ছুটিল খবর দিতে, কাল রাত্রে পূজা করিতে গিয়া রায়রায়ান একেবারে উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। রামেশ্বর কলসি লইয়া ছুটিলেন কক্ষের মধ্যে। কুলুঙ্গির টানা খুলিয়া সঞ্চয়ের অবশেষ সমস্ত সুবর্ণমুদ্রা বোঝাই করিয়া কহিলেন, ভাঙো দেউল, ভাঙো দেউল, ভাঙো দেউল—। মুঠি মুঠি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা সকলের কোলে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, স্বর্ণমুঠি ধূলিমুঠির মতো ছড়াইতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, ভাঙো, ভাঙো—

তার পর নিজেই গাঁতি লইয়া উপরে উঠিলেন।

ঝুপঝুপ শব্দে ইট-পাথর টুকরা টুকরা হইয়া পড়িতে লাগিল। মাসের পর মাস বাটালির আঘাতে পাষাণখণ্ডগুলি জীবন্ত প্রতিমার রূপ ধরিয়াছিল। বৃদ্ধ রতনদাস শিল্পীদের সর্দার। নিজে সে গাঁতি ধরিতে পারিল না, প্রাঙ্গণের একধারে দাঁড়াইয়া চক্ষু মুছিতেছিল। উন্মাদ রামেশ্বর নামিয়া আসিয়া তাহাকে দেখিলেন। দেখিয়া মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। তাহার মুখের উপরে অতি সন্নিকটে মুখ আনিয়া রামেশ্বর বলিতে লাগিলেন, কাঁদছ কেন? চুল পেকেছে বলে? এসো আমার সঙ্গে—

কেহ বুঝিবার আগেই বিশাল তরঙ্গায়িত ঘোড়াদিঘির তলহীন ঘনকৃষ্ণ জলরাশির মধ্যে রামেশ্বর ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। হায়-হায় করিয়া আকুল চিৎকার উঠিল। শত শত লোক তাঁহাকে ধরিতে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

এখন যুদ্ধ-বিগ্রহের দিনকাল নাই। সেকালের দুর্ধর্ষ চাকলাদারেরা মরিয়া গিয়াছে; সুস্থ স্বচ্ছন্দ নিরুদ্বিগ্ন বাংলাদেশ। সেই অগ্নিবর্ষী তোপগুলিরও পরমাগতি লাভ হইয়াছে। কামারের আগুনে পুড়িয়া কতক হইয়াছে কয়েদির বেড়ি কিংবা রাস্তা তৈরির রোলার। কতকগুলি নদীর পলিমাটিতে একেবারেই লুকাইয়া গিয়াছে। গ্রামে ঘুরিতে ঘুরিতে তবু কদাচিৎ ধুলামাটি-মাখা দু-একটার হঠাৎ দেখা পাইয়া যাইতে পার। হয়তো কোনও অশ্বত্থতলায় বিলুপ্ত-বংশ প্রাচীন অতিকায় কঙ্কালের মতো রোদ-বৃষ্টির মধ্যে পড়িয়া আছে, মহাকাল পদাঘাতে ঠেলিয়া

রাখিয়া গিয়াছে, ইদানীং রাখালেরা গরু ছাড়িয়া দিয়া তাহার উপরে বসিয়া বাঁশি বাজায়। এমনি একটা কিল্লাবাড়ির ঘাটে পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাইবে। সেইটা থাকায় ডোঙা বাঁধার বড় সুবিধা হইয়াছে।

কিন্তু সাবধান! ফুটফুটে জোছনা দেখিয়া রাত্রে কোনোদিন ওই ঘাট হইতে ডোঙা খুলিয়া দিও না, সহস্র সহস্র ফুটন্ত শাপলা তোমাকে দিগ্‌ভ্রান্ত করিবে। লগি ঠেলিতে ঠেলিতে হঠাৎ একসময়ে পাষাণস্তূপে ধাক্কা খাইবে, তাকাইয়া দেখিবে— একেবারে রায়রায়ানের দেউলের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। নিষুপ্ত রাত্রে দ্বীপের উপর তালগাছের ফাঁকে ফাঁকে তেরছা হইয়া পড়া জোছনা... হঠাৎ বাতাস উঠিয়া নলবন বাজিয়া উঠিবে। মনে হইবে, নির্জন ধ্বংসাবশেষ দেউলে রায়রায়ান হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন। ত্রস্ত হইয়া যেদিকে ডোঙা ঘুরাইবে, দেখিতে পাইবে সেকালের প্রস্তরীভূত অসংখ্য অপ্সরা, ময়ূর ও পদ্মফুল। অল্প অল্প মাথা তুলিয়া তাহারা তাকাইয়া থাকিবে, আলেয়ার মতো পথ ভুলাইয়া সমস্ত রাত্রি তোমাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে— ফিরিবার পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

সৈয়দ শামসুল হক
রক্তগোলাপ

বছরের এ সময়ে বৃষ্টি হয় কেউ কখনও শোনেনি। এ হচ্ছে এমন একটা সময়, যখন আকাশটা প্রজাপতির পাখার মতো ফিনফিন করতে থাকে রোদ্দুরে, নীল রঙে; যখন উত্তর থেকে নতুন প্রেমের মতো গা-শিরশির-করা মিষ্টি বাতাস বয় কি বয় না তা বোঝাও যায় না; যখন লোকেরা খুব স্ফূর্তির মেজাজে থাকে আর বলাবলি করে— সংসারে বেঁচে থাকাটা কিছু মন্দ নয়; আর ছেলেমেয়েরা কাচের জিনিসপত্তর ভাঙলেও যখন মায়েরা কিছু বলে না; যখন হাট বসতে থাকে বিকেলের অনেক আগে থেকেই আর ভাঙতে ভাঙতে অনেক রাত্তির হয়ে যায়, কারণ বছরের এরকম সময়ে অনেক রাত্রিতেও মানুষ একা হয়ে যায় না, ভয় করে না, নদীর খেয়া বন্ধ হয় না। এরকম দিনে বৃষ্টি হয় বলে কেউ কখনও শোনেনি।

কিন্তু আজ ট্রেজারির পেটা ঘড়িতে চারটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একখণ্ড কালো মেঘ এসে জমেছিল, প্রবল বাতাসের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার ওপর আধখানা হাট সবে বসেছিল, সবে গিন্নিরা পয়সা বার করে দিচ্ছিল কর্তাদের হাতে, সবে তেলেভাজাওলা তার উনুন জ্বালিয়েছিল, এমন সময় বৃষ্টি। সে বৃষ্টিতে দু হাত দূরেও কিছু আর দেখা গেল না। কেউ আর বাইরে রইল না। হাটে ডাকাত পড়ার মতো একটা শোরগোল পড়ে গেল; যে যেমন পারল রাস্তার দু পাশে জুতো কাপড় ট্রাঙ্কের দোকানের বারান্দায় ভিজতে ভিজতে এসে দাঁড়াল। এমনকি মসজিদের ভেতরটাও লোকে আর তাদের কাপড় থেকে চুঁইয়ে পড়া পানিতে গমগম সপসপ করতে লাগল; মন খারাপ করে নিমীলিত নেত্রে বসে রইলেন ইমাম সাহেব। আলু পটল কুমড়োর বড় বড় ঝাঁকাগুলো পথের ওপরেই ভিজতে লাগল। একটা খেয়া এপারে এসেছিল বৃষ্টি মাথায় করে, কিন্তু আর ফিরে যেতে পারল না। ক্যাশবাক্স গামছা দিয়ে ঢেকে ভিজতে লাগল ঘাটিয়াল, যাকে-তাকে খামোকা গালাগাল দিতে লাগল সে। ওপারে ধু-ধু পাড়ের ওপর কয়েকজন হাটুরে হতভম্ব হয়ে কোথায় পালাবে বুঝতে না পেরে যে যেদিকে পারল দৌড়ল।

সে বৃষ্টি আর থামল না।

একসময় বাতাসের এক প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাসে মড়মড় করে ভেঙে পড়ল টাউন হলের মাথা থেকে কাঠের ফ্রেমে চটের ওপর সাঁটা বিরাট প্ল্যাকার্ডখানা, তাতে লেখা ছিল :

'হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার, সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না।'

'আর্টিস্টকুলের যুবরাজ, মায়াশক্তিসম্পন্ন প্রফেসর নাজিম পাশার অদ্ভুত ইন্দ্রজাল। সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী জাদুকরের শেষ প্রদর্শনী।'

'রূপসী মিস্ চম্পার অপূর্ব ক্রীড়াচাতুর্য।'

'নয়নমন সার্থক করুন। আসুন, আসুন, আসুন।'

প্ল্যাকার্ডের এককোণে চিত্র ছিল প্রফেসর নাজিম পাশার হাসিভরা পাগড়িবাঁধা চেহারার। তার নিচে দু খানা হাড় ক্রস করে রাখা। আরেকদিকে, একটা মেয়েকে গলা থেকে হাঁটু অবধি বাক্সে বন্ধ করে করাত দিয়ে দু খানা করা হচ্ছে, রক্ত পড়ছে। প্ল্যাকার্ডের একেবারে নিচে আঁকা, কালো বোর্ডে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো একটা মেয়ে, তাকে ছোরা তুলে তাক করে আছে আরেকজন।

বসে বসে পোষা পায়রাগুলোকে দানা খাওয়াচ্ছিলেন নাজিম পাশা, এমন সময় প্ল্যাকার্ড ভেঙে পড়ল। হাতের বাটি সরিয়ে রেখে চিৎকার করে উঠলেন তিনি— 'চম্পা, চম্পা!'

টাউনহলের পেছনেই লাগোয়া দুটো ছোট কামরা আর সাজঘর। কামরাদুটোয় শহরের কর্তারা প্রাইভেট মিটিং করেন। আর সাজঘরটা কালেভদ্রে নাটক হলে ধুলো ঝেড়ে চামচিকে তাড়িয়ে ব্যবহার করা হয়। সাজঘরে বসে প্রফেসরের কোটের আস্তিনে লুকোনো পকেট নতুন করে টাকছিল চম্পা। কাল রাত্তিরের শো-এ বড় সাকরেদ জহির উইংসের আড়াল থেকে কালো সুতো— যেটা বাধা ছিল আস্তিনের এই গোপন পকেটে লাল রুমালের সঙ্গে— টানতে গিয়ে মটমট করে সেলাইসুদ্ধ খসিয়ে এনেছিল; আরেকটু হলেই দর্শকের সামনে ফাঁস হয়ে যেত জারিজুরি, ভাগ্যিস প্রফেসর টের পেয়ে তখনই ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। চম্পা সেলাই করতে করতে প্রথমে শুনল প্ল্যাকার্ড ভেঙে পড়ার শব্দ, পরক্ষণেই প্রফেসরের ডাক— 'চম্পা, চম্পা।'

নিঃশব্দে এ ঘরে উঠে এসে চম্পা দেখল প্রফেসর নাজিম পাশা দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছেন— কিন্তু বাতাসের, বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। পায়রাগুলো তার পায়ের কাছে ঘুরছে।

চম্পা অবাক হল না। একটু বিরক্ত হল।

বাবা যখন কাঁদেন, কোনও শব্দ করেন না, মনে মনে ভাবল চম্পা। কেবল গোলগাল মোটা শরীরটা একটু কাঁপতে থাকে আর লাল হয়ে ওঠে চোখ। যেমন এখন কাঁপছে। তাকে কাঁদতে দেখে চম্পা অবাক হল না, কারণ বাবা প্রায়ই কাঁদেন, রোজই কাঁদেন, একটা কিছু হলেই কাঁদেন— যা কেউ আশাও করবে না, বিশ্বাসও করবে না।

প্রথম যেদিন বাবাকে কাঁদতে দেখেছিল, অবাক হয়েছিল চম্পা। সে তখন বছর ন'য়েকের। মাকে তো সারাক্ষণ বকে বকে মাথা খারাপ করে রাখতেন বাবা; কিন্তু সেদিন চম্পা কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে বাবার ম্যাজিক দেখাবার রঙিন লাঠিটা মা 'আমার সতিন, আমার সতিন' বলতে বলতে বঁটি দিয়ে দু-খানা করেছেন আর আশ্চর্য!— বাবা বারান্দায় বসে নিঃশব্দে কাঁদছেন।

সে বছরই বাবা তার নিজের দল করেছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়সে চম্পা এসে দলের একজন হল। সে থেকে আজ প্রায় দশ বছর হয়ে গেছে। বাবা যখন স্টেজে গিয়ে দাঁড়ান, চোখ বাঁধা অবস্থায় কালো বোর্ডে অঙ্ক কষে ফেলেন, চম্পা যখন স্টেজে আসে, সবাইকে ঝুঁকে সালাম করে দুটো টুলের ওপর রাখা বাক্সের মধ্যে গিয়ে সেধোয় আর তার বাবা আর জহির করাত নিয়ে দু পাশে দাঁড়ায় তাকে জীবন্ত দু খণ্ড করার জন্যে, টুপির ভেতর থেকে বাবা যখন পাঁচটা পায়রা বের করে উড়িয়ে দেন আর ওরা চক্রাকারে হলের মধ্যে ঘুরতে থাকে, অচেনা অন্ধকার দেখে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আবার ফিরে আসে বাবার হাতেই, তখন প্রচণ্ড হাততালিতে হল ফেটে না পড়লে বাবার ভারি কষ্ট হয়। শো ভাঙলে

কোট-প্যান্ট সুদ্ধু বিছানায় এসে তিনি শুয়ে পড়েন, মিথ্যে করে বলেন, জ্বর এসেছে; চম্পা জানে বাবা তখন কাঁদছে। চম্পা বোঝাতে চেষ্টা করে, ঠাণ্ডা পড়েছে, আলোয়ানের ভেতর থেকে সবাই হাত বের করতে চায়নি, তালিটা তাই ফিকে হয়েছিল কিংবা গাঁয়ের লোক তো! ব্যাপার দেখে চক্ষু চড়কগাছ, হাততালি দেবে কী!— কিন্তু বাবা তা শুনবেন না। কাঁদবেন। এমনকি টিকেট কত বিক্রি হল, তাও আর সেদিন খোঁজ নেবেন না; সেদিন জহির আর সামাদ ক্যাশবাক্স থেকে কম করে হলেও দু খানা দশ টাকার নোট সরাবে। চম্পা এ নিয়ে হৈ চৈ করতে পারে না, বাবা শুনলে তাদের কিছু তো বলবেনই না, আবার দু হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে নতুন করে কাঁদতে বসবেন।

একবার কী হল, জহির তাক করে ছোরা ছুড়তে জানে, লক্ষ্য ফসকায় না একচুল। বাবা বললেন, তাহলে একটা বোর্ডে কাউকে দাঁড় করিয়ে জহির তার দিকে তাক করে ছোরা ছুড়বে— ছোরাগুলো চারপাশে চোখ-মুখ-গা ঘেঁষে বোর্ডে গিয়ে বিঁধবে কিন্তু মুশকিল হল জহিরের ছোরার সামনে দলের কেউ বোর্ডে দাঁড়াতে সাহস পেল না। ব্যান্ড পার্টির চারজন যারা শহরে বাজনা বাজিয়ে হ্যান্ডবিল বিলি করে, আবার শো'র সময় টিকেট বিক্রি করে এসে ম্যাজিকের সঙ্গে বাজনা বাজায়, তাদের চারটে চমৎকার নাম দিয়েছিল চম্পা— খাড়ানাক, বোঁচানাক, পট্‌কা আর চালকুমড়ো। ছোরার কথা শুনে খাড়ানাক চাকরি ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেখাল, বোঁচানাক ক্রমাগত ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল, পট্‌কা হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল, আর চালকুমড়ো গড়াতে গড়াতে গুম হয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। তখন একটা বুদ্ধি করলেন বাবা। খড়মাটি দিয়ে সুন্দর একটা কার্তিক বানিয়ে আনলেন কুমোরদের দোকান থেকে নগদ পনেরো টাকা দিয়ে। সেটাকে বোর্ডে দাঁড় করিয়ে জহিরের হাতে তিরিশটা ছোরা দিয়ে রিহার্সেল নেওয়া হল। দেখা গেল, চমৎকার তাক! একটাও মূর্তির গায়ে লাগেনি— একেবারে গা ঘেঁষে বোর্ডে বিঁধেছে। মূর্তিটা যখন সরিয়ে আনা হল, মনে হল, ছোরা গেঁথে গেঁথে কে যেন বোর্ডে আস্ত একটা মানুষের ড্রয়িং করে রেখেছে। এমনকি মূর্তির দু পায়ের মাঝখানে আধ ইঞ্চি ফাঁক— তার মধ্যেও তিনটে ছোরা বাঁট পর্যন্ত গাঁথা।

রিহার্সেল চলল কয়েক দিন। বায়না ছিল শান্তাহারের রেলওয়ে ইন্সটিটিউটে। সেখানে স্টেজে নামানো হল মূর্তিটাকে, জহির তাক করে চমৎকার ছুড়ে গেল একের পর এক তিরিশটা ছোরা। কিন্তু কেউ তালি দিল না, উল্লাসে চিৎকার করে উঠল না— বরং শোনা গেল লোকজন পটপট চেয়ারের হাতল ভাঙছে আর বলছে, মাটির মূর্তি দিয়ে ছোরার বাহাদুরি দেখানো হচ্ছে! হত জ্যান্ত মানুষ, বুঝতাম কেমন ম্যাজিশিয়ান; দুত্তোর, বাজে, বাজে! সে রাতে আর খেলা জমল না, সবাই হৈচৈ করে বেরিয়ে গেল, টিকেটের দাম ফেরতের জন্যে মহা হট্টগোল বাধাল। ওদিকে রেলের লোক এসে উনিশখানা চেয়ারের হাতল বাবদ দেড়শো টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে বসল, বাবা সাজঘরে ট্রাঙ্কের ওপর বসে কাঁদতে লাগলেন— এককোণে, অন্ধকারে।

পরদিন চম্পা এসে দাঁড়াল বোর্ডের সামনে। মিস চম্পা— প্রাচ্যের সেরা রূপসী— যার অঙ্গুলি হেলনে আকাশের বিদ্যুৎ স্তম্ভিত হয়। পরনে গলা থেকে পা পর্যন্ত সিল্কের আঁটো পোশাক, কোমর, নিতম্ব আর হাঁটুর প্রতিটি ভাঁজে যেন দাঁত কামড়ে বসেছে কাপড়, ওপরে লাল সিল্কের তেমনি আঁটোসাঁটো খাটো কোর্তা, চক্রাকারে সেলাই করে দুটো বুক চাঁদের মতো

স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে, মাথার চুল সাবান ঘষে ফোলানো, পায়ে নীল সিল্কের জুতো। বাজনা বাজল, চম্পা এসে দাঁড়িয়েছে, জহির ছোরা তুলে তাক করল। বিদ্যুৎ নেচে উঠল চম্পার চোখে এক পলকের জন্যে। জহিরকে— কিন্তু সে-কথা ভাববার এখন সময় নেই। দুম্। চোখ না নাবিয়েও চম্পা বুঝতে পারল একটা ছোরা এসে ঠিক তার গলার পাশে গাঁথল। একটা নিশ্বাস পড়ল চম্পার— সারা হল এত নিস্তব্ধ যে সেটাই তার নিজের কানে শোনাল ঝড়ের মতো। দুম দুম দুম। আর নিশ্বাস পড়ল না। সাতাশ— আঠাশ— উনত্রিশ— তিরিশ। সারা হল ফেটে পড়ল উল্লসিত হাততালিতে। বোর্ড থেকে সরে এসে তিনবার মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম করল চম্পা। জহির এসে তার কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে সুদ্ধু মাথা নুইয়ে লম্বা এক সালাম করল। আবার হাততালি। আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। চম্পার মনে হল জহির ফিসফিস করে বলছে, 'মন বলছিল তোকে জখম করে দিই চম্পা।' তার ভিতরটা থরথর করে কাঁপল। কিছু বলতে পারল না সে। জহির বলল, 'কি রে ভয় পেলি নাকি ! ঠাট্টা করছিলাম।'

কিন্তু চম্পার এত করাও শুধু শুধু। বাবার কাঁদতে হলে যেন কারণ লাগে না। একেক সময় তার মনে হয়, বাবার মতো শিশু দ্বিতীয়টি আর পৃথিবীতে নেই। আবার একসময়ে মনে হয় ওই কান্না তার সমস্ত দুর্ভাগ্যের প্রতীক। চম্পার একেক দিন মনে হয় দল থেকে পালিয়ে গেলে হয়। ওপরের গ্যালারিতে বউ-ঝিয়েরা কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে এসে বসে, ঘোমটা তুলে এ ওর হাত ধরে মাথা কাৎ করে তন্ময় হয়ে দেখে, কোলের ছেলেটা কাঁদলে তার মুখে মাই তুলে দিতে দিতে দেখে, একের পর এক তাস উড়ে যাচ্ছে হাত থেকে, কঙ্কাল নাচতে নাচতে এসে জড়িয়ে ধরছে চম্পাকে, চুমো খেতে চাইছে আবার ভ্রূকুটি করতেই দূরে সরে যাচ্ছে— চম্পা ভাবে, সেও যদি এরকম ম্যাজিক দেখতে পারত বিরাট বিস্ময় নিয়ে, কোলে থাকত খোকা, পাশে বসে ননদ কাঁধ জড়িয়ে ধরত ভয়ে।

ছোরার সেই প্রথম শো-এর পর থেকে, আজ বছর দুই হবে, চম্পা একটু বিরক্তই হয় বাবাকে কাঁদতে দেখলে। এ এক অদ্ভুত কান্না। একফোঁটা পানি পড়ে না, একটু শব্দ হয় না। কাল রাত্তিরেও ! কাল জহিরের দোষে আস্তিনের লুকানো পকেট ছিঁড়ে গিয়ে খেলা প্রায় ফাঁস হয়ে যাবার জোগাড়, জোর সামলে নিলেন বাবা; কিন্তু শো-শেষে কিস্‌সু বললেন না জহিরকে, খেতে বসে ঠিক ওইরকম শব্দহীন কান্না। বাবা যেন ভয় করেন, জহির চলে গেলে দল ভেঙে যাবে— তার বাবা 'মায়াশক্তিসম্পন্ন প্রফেসর নাজিম পাশা।'

বৃষ্টিটা একটুও কমেনি ! বরং বুঝি আরও জোর হয়েছে। প্রফেসর দু হাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন। জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট এসে শিশিরের মতো সাজ হয়ে পড়েছে তার দু হাতের পিঠে। চম্পার পায়ের শব্দে পায়রাগুলো হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। চম্পা একটু বিরক্তি নিয়েই ডাকল, 'কী বাবা?'

প্রফেসর মুখ তুলে তাকালেন। হাত আস্তে নেবে এল কোলের ওপর। দেখলেন, সন্ধের শো-র জন্যে চম্পা মুখে রঙ মেখে একেবারে তৈরি। বাকি কেবল ড্রেস করবার। যে জানালা দিয়ে শোনা গিয়েছিল প্ল্যাকার্ড পড়ে যাবার শব্দ, সেদিকে অস্পষ্ট একটা হাতের ইঙ্গিত করে প্রফেসর বললেন, 'চম্পা, আজ বোধহয় শো হবে না।'

তার কথায় সায় দিয়েই যেন কড়কড় করে দীর্ঘ একটা বিদ্যুৎ ডেকে উঠল দূরে— দূর থেকে নিকটে।

'এত বিষ্টিতে কে আসবে?'

দেখল বাবার চোখ লাল টকটকে হয়ে গেছে শব্দহীন কান্নায়। হঠাৎ কেমন মায়া হল চম্পার, বলল, 'তুমি কী জানো, বিষ্টি যেতে কতক্ষণ। তা ছাড়া আজ এদের হাট। মফস্বল থেকে অনেকে আমাদের দেখবে বলে এসেছে। যত রাতই হোক আসবে।'

'আসবে?'

চম্পা সেদিকে কান না দিয়ে বলল, 'বরং শো এক ঘণ্টা পিছিয়ে দাও। আর তুমি এক্ষুনি গিয়ে স্টেজ গুছিয়ে ফেলো, ড্রেস করে নাও। সময় কই?'

তার কথায় যেন কাজ হল। উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। পকেট থেকে রুমাল বের করে ফ্যাচ করলেন একবার। চম্পা বলল, 'তোমার কোটের আস্তিন হয়ে গেছে।'

'ভালো।' তার পর হঠাৎ চোরের মতো তাকিয়ে প্রফেসর শুধোলেন, 'প্ল্যাকার্ডটা পড়ে গেল শুনেছিস?'

'হ্যাঁ।'

আর কিছু না বলে সাজঘরের দিকে চলে গেলেন প্রফেসর। চম্পা দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। এতক্ষণে তার চোখে পড়ল পাশের দরজাটা খোলা, ও ঘরে চৌকির ওপর পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে জহির। ঘুমোচ্ছে না, চোখ পিটপিট করে দেখছে চম্পাকে। আর তার পায়ের আঙুল মটকাচ্ছে সামাদ। প্রফেসর চলে যেতেই তড়াক করে উঠে বসল জহির। বলল, 'চম্পা, শোন্।'

'কী?'

'এদিকে।'

চম্পা এলে জহির হাসল। বিরক্ত হয়ে চম্পা শুধোল, 'কী বলবে?'

'যা বিষ্টি, সব ভেসে যাবে নাকি, অ্যাঁ?'

'যাক।'

'একটু চা হয় না চম্পা?'

'বানিয়ে নাও গে। আমি জানি না।'

খপ্ করে চম্পার হাতটা ধরে ফেলল জহির। তার কী ইশারা ছিল, সামাদ কেটে পড়েছে।

'চম্পা তোকে পায়রা বানিয়ে রাখতে পারি, থাকবি?'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চম্পা বলল, 'কোথায়?'

'আমার আস্তিনে।'

'বানাও দেখি কেমন ওস্তাদ।'

চম্পার কণ্ঠে বিদ্রূপ ঝরে পড়ে। কিন্তু জহির সেটা বুঝতে পারে না। সে মনে করে, চম্পার মনটাও আজ বৃষ্টিতে হু-হু করছে।

বলে, 'তাহলে চোখ বন্ধ কর।'

করল চম্পা। সে জানে, এরকম একটা সুযোগ হয় না। ঠোঁট তাই হাসিতে মাখা মাখা হয়ে ওঠে। জহির বলে, 'হাসছিস যে?'

'এমনি।'

জহির চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকা চম্পার রূপ নিরিখ করে কিছুক্ষণ। মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ লাফিয়ে ওঠে তার। সারা শরীরের মধ্যে শুধু ওই হাসি হাসি ঠোঁট ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না জহিরের।

প্রায় চিৎকার করে ওঠে সে। মুখটা নামিয়ে এনেছিল, চম্পা তার নিচের ঠোঁটে আচমকা দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। রক্ত পড়ছে। দুম করে একটা চড়। খিলখিল করে হেসে উঠল চম্পা।

'পায়রা! ইশ, ওস্তাদ কত! আয়না এনে দেব, কেমন গাধার মতো দেখাচ্ছে?'

স্টেজে নামবার জন্যে মুখে রঙ মেখেছিল চম্পা, তার খানিকটা লেগেছে জহিরের চিবুকে। তাই দেখে চম্পা লুটিয়ে পড়ল হাসিতে। হাসতে হাসতেই সে দৌড়ে গেল সাজঘরের দিকে।

কিন্তু বৃষ্টি কমবার কোনও লক্ষণই নেই। আস্তে আস্তে সূর্য অস্তাচলে গেলেন। তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে আরও ভয় করতে লাগল সবার। মনে হল, সমস্ত পৃথিবীকে কোনও এক অশরীরী শক্তি দু হাতে সংকুচিত করে শ্বাসরোধ করতে চাইছে। বিদ্যুতের মধ্য দিয়ে তার দম্ভ, বৃষ্টিতে তার সংহারের সংকল্প, হঠাৎ নেমে আসা শীতের মধ্যে তার জয়ের উল্লাস যেন লেখা।

হ্যাজাক দুটো ধরাল সামাদ। একটা সে রাখল স্টেজের ওপর, আরেকটা সাজঘর আর তার পাশের ঘরের মাঝখানে টুলের ওপরে— যেখানে বসে প্রফেসর কাঁদছিলেন। হ্যাজাকের ফিনফিনে আলো থেকে ভ্রমরের মতো একটানা গুঞ্জন সারা টাউনহলের ভেতরে ঘুরতে লাগল। প্রফেসর ড্রেস করে খামকা পায়চারি করছেন খালি স্টেজে। চম্পা ড্রেস করেনি, সে একটা টুলের ওপর বসে অস্বচ্ছ চোখে বাবাকে দেখছে। আর জহির আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁটের নিচে চম্পার দাঁতের দাগ পড়ছে একমনে। ছোট সাগরেদ সামাদ কী করবে বুঝতে না পেরে উবু হয়ে বসে সিগারেট খাচ্ছে। তার কোনও কথা নেই, শো হোক, আর না হোক, চম্পা জহিরকেই বিয়ে করুক আর হাতিকেই করুক, মাস কাবারে তার আশি টাকা পেলেই হল।

এমন সময় ভিজতে ভিজতে ব্যান্ডপার্টির চারমূর্তি ভূতের মতো এসে হাজির। খাড়ানাক, বোঁচানাক, পটকা আর চালকুমড়ো। তারা এসে মহাগম্ভীর হয়ে থাকল, কাউকে কিছু বলল না। পটকা বারান্দার এককোণে বাতাস বাঁচিয়ে আগুন করল খানিকটা। খাড়া-নাক বসে বসে তার ড্রামদুটো সেঁকতে লাগল সেই আগুনে। বৃষ্টির পানিতে একেবারে মিইয়ে গেছে খোলটা। কিন্তু পরনের কাপড় ভিজে একসা, সেদিকে চোখ নেই। বোঁচানাক আর পটকা বসে বসে ভিজে হ্যান্ডবিলগুলো একটা আরেকটার গা থেকে ছাড়াতে লাগল। চালকুমড়ো তার বিউগিল থেকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে পানি বার করতে লাগল আর ক্ষণে ক্ষণে চোঙের মধ্যে চোখ লাগিয়ে পরখ করতে শুরু করল। এ যন্তর নিয়ে আবার ভারি মুশকিল! আগুনের আঁচ পেলে সোনালি কলাই উঠে তামা বেরিয়ে পড়বে।

চম্পা এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। একমুহূর্ত দেখল ওদের কাণ্ডকারখানা। বিশেষ কাউকে লক্ষ্য না করেই সে জবাব দিল, 'কি রে?'

'আবার কী? হাটের দিকে যাব যাব, বিষ্টি নামল।' বলল খাড়ানাক। রাগটা তারই বেশি। কারণ ড্রামটা আঁচে ধরতে গিয়ে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছিল তাকে। চম্পা বলল, 'এই পটকা, ওর সঙ্গে হাত লাগা না। নবাব হয়েছিস?'

সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ড্রাম নাবিয়ে চেঁচিয়ে উঠল খাড়ানাক, 'থাক, থাক, অমন কাজের কর্তা আমার দরকার নেই। চাই কি খোলসুদ্ধু দেবে পুড়িয়ে।'

পট্‌কা চম্পার ডাক শুনে চোখ তুলে তাকিয়েছিল, আবার নিবিষ্টমনে সে ভিজে হ্যান্ডবিল ছাড়াতে লাগল। হি হি করে হেসে উঠল চম্পা। একটা টুল টেনে জুত করে বসল তার ওপর। বলল, 'সবগুলোর মেজাজ একেবারে ছিপ হয়ে আছে। হি হি হি।'

চালকুমড়োর একটু বুদ্ধি কম। সে হাঁ করে ভাবল খানিক, পরে জিজ্ঞেস করল, 'ছিপ মানে?'

'মানে? বলছি।' বলেই চম্পা একটা সরু ভাঙা ডাল হাতে তুলে ধরে এক মাথা ধনুকের মতো টেনে এনে শন করে ছেড়ে দিল, চটাং করে পড়ল চালকুমড়োর পিঠে। তিড়বিড় করে উঠল সে ব্যথায়।

চম্পা বলল, 'এর নাম ছিপ। বুঝলি? এই পট্‌কা। পট্‌কা?'

'জী।'

'থাক, আর হ্যান্ডবিল ছাড়িয়ে কাজ নেই। চাট্টি খিচুড়ি রাঁধবার জোগাড় দেখ গে। আজ আর শো হবে না।' আড়মোড়া ভাঙল চম্পা, যেন কদ্দিন ঘুম হয় না তার, আজ একটু ঘুমোবে।

চারকণ্ঠ একসঙ্গে শুধাল, 'কেন, শো হবে না কেন?'

বোঁচানাক বলল, 'বা রে, আমরা তো বিলি কাগজ নিয়ে বেরিয়েছিলাম। আমাদের দোষ কী?'

'দূর গাধা।' চম্পা পা দিয়ে বোঁচানাকের পেটে খোঁচা দিল একটা। 'দেখছিস না বিষ্টি, লোক হবে কোত্থেকে?'

'ওস্তাদ বলেছে?'

'আমি বলছি। না বাপু আর পারি না। এই খাঁদা, এক কেৎলি পানি দে না চায়ের। বসে বসে খাই। আর আমার বালিশের পাশে একখানা পাউরুটি আছে, আনবি?'

চম্পার ওই একটা স্বভাব। এই চারমূর্তির সঙ্গে বসলে কথার খই ফুটতে থাকে। একমুহূর্ত স্বস্তিতে থাকতে দেয় না কাউকে। আজ শো না হলে যে তাদের আসা-যাওয়ার খরচই উঠবে না, ফলে খাবার পয়সা থাকবে না, সেটা যেন এখন বেমালুম ভুলে গেছে চম্পা। সে ভাবনা করছেন একা স্টেজে পায়চারি করতে করতে প্রফেসর নাজিম পাশা, বারো বছর আগে যিনি তাঁর ওস্তাদ প্রফেসর জে.সি. দত্ত হিন্দুস্থানে চলে যাবার পর নিজের নাম নাজিমুদ্দিন ভূঁইয়া থেকে নাজিম পাশা বানিয়ে দল করেছিলেন।

খাড়ানাক এসে বলল, 'পাউরুটি বোধহয় ইঁদুরে খেয়ে ফেলেছে; পাওয়া যাচ্ছে না।'

'ইঁদুরে না তুই?' তারস্বরে জানতে চাইল চম্পা। 'বল্, কোথায় লুকিয়ে রাখলি?'

জহির এসে বসল চম্পার গা-ঘেঁষে আরেকটা টুল নিয়ে। বলল, 'থাক, আর রাগ করিসনি চম্পা। সিগরেট খাবি?'

চম্পা তাকে কিছু বলল না, বলল খাড়ানাককে— 'যাক, আজ মাফ করে দিলাম।' আর বলতে বলতে জহিরের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে গুঁজল। জহির তার ম্যাচ জ্বালিয়ে ধরল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে চম্পা বলল, 'কী বাজে সিগারেট যে খাও! গন্ধে পেট মোচড়াতে থাকে।' আরেকটা টান দিয়ে বলল, 'ঠাণ্ডাও নেহাত মন্দ পড়েনি।'

তার সিগারেটের দুর্নাম শুনে জহির একটু মুখ শুকোল। রাগ ঝাড়ল পট্‌কার ওপর। মাথায় তার চাঁটি মেরে বলল, 'হারামজাদা চায়ের পানি বসাতে এতক্ষণ?'

চারমূর্তির মধ্যে পটকাই সবচেয়ে নিরীহ। কিন্তু তার চোখও জ্বলে উঠল জহিরের মার খেয়ে। মুখে কিছু বলল না। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে চায়ের পানি আগুনে বসাল দু খানা ইট পেতে।

ঠিক তখন । একসঙ্গে চমকে মুখ ফিরিয়ে সবাই দেখে বারান্দার নিচে তাদের পেছনে একজন গাছের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে অন্ধকারে। নড়ছে না, শব্দ করছে না। বৃষ্টি আর অন্ধকারে ভালো করে ঠাহরও হচ্ছে না মানুষ না আর কিছু।

'কে? কে ওখানে?' টুল থেকে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জিজ্ঞেস করল জহির। বৃষ্টির এই ঠাণ্ডার জন্যে কিনা কে জানে, হঠাৎ তার কণ্ঠ বড় দুর্বল আর ভাঙা শোনাল। বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল চম্পা।

লোকটা তখন আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠে দাঁড়াল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সবাই। কেউ তাকে চেনে না, এর আগে কখনও দেখেনি। ওরা ভাবল, এ শহরের কেউ হবে— হয়তো থানার দারোগার জন্যে দশখানা পাস চাই, কি কোনও কর্তা পাঠিয়েছেন জানবার জন্যে যে চম্পা রাতে নেমন্তন্ন নিয়ে থাকে কিনা। বড় অস্বস্তি বোধ করল চম্পা। কিন্তু সে একমুহূর্তের জন্যে! সবার ভেতরে চম্পাই প্রথম বুঝতে পারল, ওরকম প্রস্তাব যারা নিয়ে আসে তারা দেখতে আলাদা, তাদের চালচলন অন্যরকম। এ লোকটার পোশাক সাধারণ, কিন্তু কেমন সুন্দর গায়ে মানানো, চেহারা কিছু না, কিন্তু চোখ ফেরানো যায় না। শ্যামবর্ণ লম্বাটে মুখের মধ্যে সবকিছু হারানো-খোয়ানোর স্থির একটা ছবি যেন। যেন লোকটা সারাক্ষণ কী ভাবছে তার কোনও সমাধান হচ্ছে না, তাই ভারি অন্যমনস্ক।

জহির একবার দ্বিধা করল— তুমি না আপনি। জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই?'

লোকটা এবারও কোনও জবাব দিল না। তার মোটা পাজামা থেকে পানি নিঙড়ে, শার্টের খুঁট দিয়ে মুখ মুছল। বড় পরিতৃপ্ত দেখাল তাকে তখন।

ব্যান্ডপার্টির চারমূর্তি তখন থেকে থ'। জহির কিছু বুঝতে না পেরে চম্পার কাঁধে হাত রাখল, চম্পা সেটা সরিয়ে দিল কাঁধ নামিয়ে— কিন্তু দুজনের কারও মন ছিল না তাতে। তারা দেখছে লোকটাকে। আর লোকটা তখন হাঁটু গেড়ে আগুনের পাশে বসে হাত সেঁকছে একমনে।

জহিরের আর সহ্য হল না। এতক্ষণ তার কথার জবাব না পেয়ে মেজাজ সপ্তমে উঠবারই কথা। হয়তো একটা কিছু করতে যাচ্ছিল, তার আগেই চম্পা হাতের সিগারেটটা আগুনে ফেলে দিয়ে শুধাল, 'থাকো কোথায়?'

লোকটা ফিরে তাকাল চম্পার দিকে। অস্পষ্ট একটা হাসিতে এক পলকের জন্যে মুখটা আলো হয়ে উঠল, এক হাতে বিশেষ কোনোদিকে না দেখিয়ে, যার মানে যে-কোনও দিক হতে পারে, বলল, 'ওদিকে।' তার কণ্ঠ শোনাল অদ্ভুত, যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসা একটা গম্ভীর মেঘ। সেই কণ্ঠ সবাইকে অবশ করে দিয়ে গেল, বিশেষ করে জহিরকে।

লোকটা চম্পার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বিষ্টিটা এখনি যাবে। আমি দেখে এসেছি, ওদিকে আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে।'

ওদিকে বলতে কোন্ দিক বোঝাল কে জানে। হঠাৎ সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে, এ কী! তারা দেখা যাচ্ছে। একফোঁটা বৃষ্টি নেই, বাতাস নেই— একেবারে ছবির মতো।

আকাশ থেকে তাড়াতাড়ি চোখ ফেরাল চম্পা। লোকটা তখন একমনে তার জামা শুকোচ্ছে আগুনে। কী একটা বলতে যাচ্ছিল চম্পা, বলতে পারল না। লোকটা এমন তন্ময় হয়ে আছে যে চম্পার যেন সাহস হল না।

তাকে সম্ভ্রম করে পটকাও কেতলিটা নাবিয়ে নিয়ে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্যি, তার পানিও গরম হয়ে গিয়েছিল, সে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল চা বানাতে। আর বৃষ্টি থেমেছে দেখে জহির তাড়াতাড়ি দৌড়ুল সাজঘরের দিকে।

সেখানে গিয়ে প্রফেসরকে সে পেল না। স্টেজে উঁকি দিয়ে দেখে সেখানে তিনি একটা চেয়ারে বসে আছেন, পা দোলাচ্ছেন। তাকে গিয়ে সে বলল, 'বিষ্টি তো নেই!'

'নেই মানে?'

'ধরে গেছে।'

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। জহিরকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তা হাঁ করে আমার চেহারা কী দেখছ? সামাদ কই, ব্যান্ডপার্টি গেল কোন চুলোয়? বাজনা বাজাক, টিকেটঘরটা খুলে দিচ্ছে না কেন? আমি মরে গেছি নাকি, বলে কী এরা? চম্পা চম্পা।'

আবার সেই ডাক। কিন্তু এ ডাক শুনতে পেল না সে এবার। সে তখন কথা জুড়ে দিয়েছে সেই লোকটার সঙ্গে, পটকা চা এনে দিয়েছে চুমুক দিতে দিতে।

'কী নাম?'

'আল্লারাখা।'

'হি হি হি।'

আল্লারাখা তখন খাড়ানাকের ড্রামটা আগুনের ওপর ধরে ঘুরিয়ে গরম করছে। চম্পাকে হাসতে শুনে এক পলক চোখ তুলে নাবিয়ে নিল, তার পর নিচুগলায় কৈফিয়ত দিল— 'আমার সব ভাইবোনগুলো হত আর মরে যেত। তাই সবশেষে আমি যখন হলাম, মা নাম রাখলেন আল্লারাখা। আমি কী করব?'

'হি হি। বাহ্, নিজের নাম কেউ বদলাতে পারে না নাকি? আমার বাবাও নাম বদলেছে। আমার নামও চম্পা না। তুমি বদলাবে?'

লোকটা খুব উৎসাহী হয়ে উঠল। চম্পার দিকে হঠাৎ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শুধাল, 'আমাকে তোমরা নেবে?'

'নেব মানে?'

'দলে।'

'না বাপু, আমাদের লোক দরকার নেই।'

'তাহলে নাম বদলে কী হবে?' বলল আল্লারাখা।

তখন প্রফেসরের পেছনে পেছনে এল জহির । দেখেই সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। 'এ লোকটা আছে এখনও? অ্যাঁ? চম্পা, এত হাসি কিসের?'

প্রফেসর কিছু বুঝতে না পেরে একবার চম্পার দিকে, একবার লোকটার দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করতে লাগলেন। আরও খিলখিল করে হেসে উঠল চম্পা। 'বাবা, বলে নাম আল্লারাখা। হি হি হি ।'

লোকটা আগুনের ওপর ড্রামটা ধরে রেখে আড়চোখে দেখছিল চম্পাকে, তার কপালের ওপর আধখানা চাঁদের মতো দুলতে থাকা একগুচ্ছ চুল। আর ভাবছিল, সে পারত, সে

এক্ষুনি অবাক করে দিতে পারত চম্পাকে, যদি চম্পার ওই চুলের চাঁদ সে একটুখানি স্পর্শ করতে পারত।

হাসির সঙ্গে সঙ্গে নেচে উঠছিল চম্পার কপালে সেই চুলের গুচ্ছ। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বুঝি আল্লারাখা। হঠাৎ এক অঘটন ঘটল। হাত থেকে ড্রামটা পড়ে গেল গন্‌গনে আগুনে। ভালো করে বোঝার আগেই পটাশ করে একটা শব্দ হল খোল ফেটে যাওয়ার, তার পর উঠতে লাগল চামড়া পোড়ার কটু গন্ধ।

হতভম্ব হয়ে গেল সবাই। বেওকুফের মতো উঠে দাঁড়াল আল্লারাখা। খাড়ানাক আর চাল্‌কুমড়ো ড্রামটাকে কোনোরকমে তুলে বারান্দার নিচে বৃষ্টির জমা পানিতে ছুড়ে ফেলল। ফ্রেমসুদ্ধু জ্বলে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল।

ঝাঁপিয়ে পড়ে আল্লারাখার কলার চেপে ধরল জহির, 'তোকে ড্রাম ধরতে বলেছিল কে?' বলেই এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল সে, যার টাল সামলাতে অনেকক্ষণ লাগল আল্লারাখার। প্রফেসর বললেন, 'চম্পা, আমি বুঝতে পারছি না আমার ওপর এত গজব কেন?'

কী হয়েছিল, চম্পা থরথর করে কাঁপছিল। প্রফেসর তাকেই ধমকাতে লাগলেন, 'এখন ড্রামটাও পুড়ল। একটার দাম কত জানিস? আমাকে কাটলেও দশটা ফালতু টাকা বেরোবে না। কোত্থেকে এ উজবুকটা এল রে, চম্পা?'

পানিতে চুবিয়ে ড্রামটা আবার বারান্দায় তুলে এনেছে খাড়ানাক আর চালকুমড়ো। গোলমাল শুনে সামাদ, পটকা আর বোঁচানাকও ঘিরে দাঁড়িয়েছে! সামাদ বলে উঠল, 'ব্যাটা মিচকে যেন কিছু জানে না। বোবা নাকি?'

আল্লারাখা ড্রামটার দিকে তাকিয়ে দেখল, তার পর চম্পা আর প্রফেসরকে বলল, 'ফ্রেমটা বেঁচে গেছে। একটা খোল পেলে আমি ছেয়ে দিতে পারতাম।' আশেপাশে সে তাকাল, যেন এখানেই কোথাও এক-আধটা খোল পাওয়া যাবে।

হুংকার দিয়ে উঠল জহির, 'ছেয়ে দিতে পারতাম!! শুয়োরকা বাচ্চা। তোর পিঠ থেকে চামড়া তুলে আমি খোল বানাব আজ।'

'একটা কিছু নেই এখানে?' আল্লারাখা বিড়বিড় করে বলল, যার অর্থ কেউ বুঝতে পারল না।

প্রফেসর ড্রামের কাছে উবু হয়ে বসে হাত বুলোতে লাগলেন পোড়া খোলের ওপর, যেন এক্ষুণি তিনি জাদুবলে ভালো করে দিতে পারবেন। মন্ত্রপড়ার মতো তিনি বলে চললেন, 'আমার কাছে বলে একটা পয়সা টাকার সমান। এটাকে ঢোকাল কে এখানে? কোত্থেকে এল রে গরুটা। আমাকে পথে বসিয়ে দিয়ে গেল রে চম্পা।'

এতক্ষণে চম্পার মনে পড়ল কপালের ওপর একগুচ্ছ চুল তখন থেকে সুড়সুড় করছে। সেটাকে হাত দিয়ে সরাতে গিয়ে চোখে চোখ পড়ল আল্লারাখার। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে চম্পার দিকে।

'আবার মেয়েছেলের দিকে চোখ!' জহির ঠাশ করে একটা চড় বসিয়ে দিল আল্লারাখার গালে। যেন আগুন ধরিয়ে দিল কেউ। চোখের উপর থেকে চম্পার চেহারা মুছে গেল। আল্লারাখা ঘুরে পড়তে পড়তে কাঠের মোটা থামের সঙ্গে মাথা ঠুকে বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠল কপালের বাঁ দিক টোম্যাটোর মতো।

প্রফেসর আর্তনাদ করে উঠলেন, 'চম্পা , ওকে মারিস নে। মরে যাবে যে।' আবার সেই শব্দহীন কান্না।

চম্পা বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমি কোথায় মারছি।' আল্লারাখা একবার আকুল হয়ে প্রফেসরকে দেখবার চেষ্টা করল ব্যথা ভুলে। কিন্তু ভয় করল আবার যদি চম্পার দিকে চোখ পড়ে তার। পট্‌কা আর বোঁচানাক তাকে টেনে তুলল পায়ের ওপর। কপালটা দেখে দুজনে দাঁত বার করে বলল, 'মাথা ফাটেনি ওস্তাদ। অ্যাকটিং করছে।'

জহির তখন গজরাচ্ছে, 'মারবে না, শালাকে সোহাগ করবে !'

জহিরের মুখের কথা মাটিতেও পড়তে পারেনি, এমন সময় বাইরে একটা প্রচণ্ড হৈ চৈ ফেটে পড়ল। অনেকগুলো লোক একসঙ্গে পাগলের মতো চিৎকার করছে আর টাউনহলের টিনের বেড়ায় পড়ছে দমাদম ইট-পাটকেল। আল্লারাখার হাত ছেড়ে দিয়ে পট্‌কা কানখাড়া করে বলল, 'কী যেন শুনছি?' ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

ভয় পাবার কথাই। শ-খানেক লোক কোত্থেকে ভূতের মতো একসঙ্গে হয়েছে, অন্ধকারে তাদের ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, রাস্তাটা ভরে গেছে, শুধু চিৎকার শোনা যাচ্ছে আর ইট-পাটকেল। ভেঙে-পড়া প্ল্যাকার্ডটার ওপর কয়েকজন বেদম নাচছে আর লাথি মারছে। আবার কেউ আমলকী গাছ বেয়ে উঠে গেছে ওপরে, সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ল হলের ছাদের ওপর। বিকট একটা শব্দ হল।

'বেরিয়ে আয় ম্যাজিকের বাচ্চা। বেরিয়ে আয়। ছুঁড়িটা গেল কোথায়? কোন্ ভাগাড়ে মরল সব? চালাকির জায়গা পাওনি বদমাশ!' এইরকম সব হাঁকডাক চলছে। কেউ আবার চিৎকার করে উঠছে, 'নাজিম পাশা'— সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করছে সবাই, 'ধ্বংস হোক।' আরেকবার একজন হাঁক দিল, 'কুড়িগ্রাম'— আবার সমবেত চিৎকার, 'ছাড়তে হবে।' কে যেন এরই মধ্যে ফোঁড়ন কাটল, 'জাদু মেরে হাওয়া হয়ে গেল নাকি বাপ!' অমনি দুপদাপ পড়তে লাগল ইট। ছাদে যে-লোকটা লাফিয়ে পড়েছিল সে উপুড় হয়ে ককিয়ে উঠল, 'আমি ভাই আমি।' একটা ঢিল এসে লেগেছে তার। কিন্তু তার কণ্ঠ কেউ শুনতেই পেল না।

জহির উঁকি মেরে ব্যাপার দেখেই ছুট দিল। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রফেসরকে গিয়ে খবর বলল, 'পাবলিক খেপেছে!'

'হ্যাঁই, পাবলিক খেপেছে? কেন?'

'কী জানি!'

প্রফেসর আজ তিরিশ বছর ধরে ম্যাজিক দেখিয়ে খাচ্ছেন। লোকের নাড়ি-নক্ষত্র তাঁর জানা। কিন্তু তিনি যেন ঘাবড়ে গেলেন আজ। কারণ, কোনও কারণ খুঁজে পেলেন না তিনি, কেন ওরা খেপতে পারে। কাল রাতের শো তো চমৎকার গেছে। আর আজ শো হলই-বা কোথায় যে ওরা খেপবে? বেওকুফের মতো তিনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন দলের সবার দিকে।

চম্পা বলল, 'জহির তুমি একবার যাও না, দেখে এসো কী ব্যাপার।'

প্রফেসর যেন এই সোজা কথাটাই এতক্ষণ মাথা থেকে বার করতে পারছিলেন না। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ চম্পা, ও যাক, দেখে আসুক।'

দড়াম করে একটা ইঁট এসে পায়ের কাছে দশ টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল। ব্যান্ডপার্টির চারমূর্তি নিমেষে অন্তর্হিত হল ঘরের মধ্যে। হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন প্রফেসর। তার পর চম্পার দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'চম্পা, শিগগির ঘরে যা, খিল দে।' পরমুহূর্তেই ফাঁকা হয়ে গেল বারান্দা। একা আল্লারাখা দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারে, কেউ তাকে লক্ষ্যও করল না। বাইরে যে এতবড় একটা গোলমাল চলছে তার যেন কোনও প্রতিক্রিয়াই নেই আল্লারাখার মুখে। সে নিঃশব্দে তার ডানহাতের আঙুলগুলো চোখের সামনে তুলে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

বাইরে একজন হঠাৎ হৈ চৈ করে উঠল, 'ওই যে, ওই বেরিয়েছে।' সবাই তখন চোখ তুলে দেখে দোতলার বারান্দায় এক মূর্তি; জহির এসে দাঁড়িয়েছে ওপরতলায় মেয়েদের গ্যালারির পাশে ছোট্ট ঝোলানো বারান্দায়। ক্ষীণকণ্ঠে সে দু হাত তুলে বলল, 'শান্ত হোন ভাইসব, আপনারা শান্ত হোন।'

সবাই একটু চুপ করল। এক মুহূর্তের জন্যে। কে একজন বলল, 'আরে এটা তো সাকরেদটা।' সঙ্গে সঙ্গে আবার গোলমাল শুরু হয়ে গেল।

'সাহস থাকে, তোর ওস্তাদকে বেরিয়ে আসতে বল্।'

'মার, মার শালাকে।'

আবার উড়তে লাগল থান ইঁট। জহির কোনোরকমে দৌড়ে পালাতে গিয়ে অন্ধকারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। নষ্ট করবার মতো সময় নেই। তক্ষুনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে গ্যালারির দরজাটা বন্ধ করে হাঁফাতে লাগল সে।

সাজঘরে প্রফেসর চম্পাকে জড়িয়ে ধরে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। এ শহরে কি পুলিশ নেই? আইন নেই? তার মনে হচ্ছিল যে এ যাত্রা বাঁচলেও যেন বিশ্বাস হবে না বেঁচেছেন। চম্পাকে ডাকাতি করে নিয়ে যাবে নাকি? ভরসা কী! জোয়ান মেয়েছেলে, তার ওপর শো-এর মেয়ে! কোন্ কর্তার চোখ পড়েছে আল্লা জানে। প্রফেসর বিড়বিড় করে চম্পাকে বললেন, 'ভয় করিস না চম্পা। ভয় করিস না। দরজা বন্ধ আছে।'

কিন্তু চম্পারও ততক্ষণে ভয় করতে শুরু করেছে। ছাদের ওপর পর পর দুটো ইঁট এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাঙ্কের ওপর বসে পড়ল বাপ আর মেয়ে। কোলাহল শুনে মনে হল, ওরা এবার হলের মধ্যেই ঢুকে পড়েছে। স্পষ্ট গলা শোনা যাচ্ছে, 'নাজিম পাশা— ধ্বংস হোক।' এমনকি স্টেজের ওপরেও দুপদাপ শুরু হয়ে গেছে। চড়চড় পর্দাটা ছিঁড়ে পড়ল বুঝি।

হঠাৎ সব চুপ। বিশ্বাস হল না প্রফেসরের। ভাবলেন, তার কান খারাপ হয়ে গেল নাকি? চম্পার মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন, চম্পাও অবাক হয়ে মাথা তুলছে।

সত্যি, একেবারে নিঃশব্দ। পিন পড়লেও শোনা যাবে। কী ব্যাপার? থেমে গেল কেন সব? পুলিশ? গ্যালারির নিচে লুকিয়ে ছিল জহির, সেও হামাগুড়ি দিয়ে বেরুল। ব্যান্ডপার্টির চারমূর্তি ঘরের খিল খুলে উঁকি দিল। সাজঘর থেকে বেরিয়ে এলেন প্রফেসর আর চম্পা।

তারা সবাই দেখল, স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আল্লারাখা। আর জনতা সারা হলে যে যেখানে ছিল স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে পড়েছে। হ্যাজাকে তেল পোড়ার সুমসুম শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। প্রফেসর কি স্বপ্ন দেখছেন? চম্পার কপালের ওপর চাঁদের মতো আবার সেই একগুচ্ছ চুল লাফিয়ে পড়ল। বিস্ময় চোয়ালে ঝুলে পড়ল জহিরের।

আল্লারাখা এক হাত তুলল, সময় নিয়ে সবার ওপরে চোখ বুলিয়ে আনল, তার পর তার সেই মেঘের মতো কণ্ঠ ধ্বনিত হল সারা হলে।

'দেখুন, এটা আপনাদের নিজেদের ক্ষতি। নিজেদের টাউন হল নিজেরাই ভাঙছেন। আপনাদের যা বলবার আছে বলুন, হৈ চৈ করবেন না।'

কেউ কোনও উত্তর দিল না।

'বলুন।'

কেউ নড়ল না। যেন কারও আর একফোঁটা শক্তি নেই মনে কিংবা শরীরে। এমনকি, অনেককে লজ্জিত দেখাল, বিব্রত মনে হল।

'তাহলে আপনাদের কিছু বলার নেই?' আল্লারাখার গম্ভীর কণ্ঠ আবার বৃথাই ঘুরে বেড়াল সারা হলে। তখন সে স্টেজ থেকে চলে যাবার জন্য মুখ ফেরাল।

জনতার হঠাৎ একজন কথা বলে উঠল। থামল আল্লারাখা।

'বিষ্টিতে আমাদের জিনিসপত্র সব ভেসে গেছে। নৌকাডুবিতে মরেছে তেরোজন। মসজিদের ছাদ ভেঙে পড়েছে।'

তখন আরেকজন যোগ দিল, 'শুনছি, রেললাইন ডুবে গেছে, আজ ট্রেন আসবে না।'

'হাটে যারা দোকান দিয়েছিল, সব ভেসে গেছে— রাস্তার ফকির হয়ে গেছে বড় বড় ব্যাপারীরা।'

এবারে কয়েকজন একসঙ্গে বলল, 'এ মওসুমে কোনোদিন এমন বিষ্টি হয় না।'

আল্লারাখা সবার কথা শুনল। এক বুড়ো এবার ভিড় ঠেলে কাছে এল তার। চোখে বোধহয় ভালো দেখতে পায় না। চোখ পিটপিট করে সে বলল, 'এ বিষ্টি তো আসবার কথা না বাবা। জাদুতে কী না হয়? এ জাদুর কীর্তি, তোমাদের কীর্তি। আমি বাবা অনেক দেখেছি। কাল তোমরা এসেছ, আর অমনি ঝড়-তুফান।'

আবার সবাই হৈ হৈ করে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসব জাদু চলবে না। টাকা দিয়ে যেতে হবে। কই হে, কার কত বলো!'

ভিড় হঠাৎ এগিয়ে আসছিল, আল্লারাখা হাত তুলতেই সবাই থেমে গেল। উইংসের আড়াল থেকে চম্পা ফিসফিস করে বলল, 'বাবা, লোকটার কথা ওরা এত শুনছে কেন?'

'কী জানি। বোধহয় কিছু জানে!'

প্রফেসর আর চম্পার দৃষ্টি বিনিময় হল, যার অর্থ একমাত্র জাদুকরেরাই জানে।

আল্লারাখা তখন বলে চলছে, 'শুনুন, বিষ্টি এনে প্রফেসর নাজিম পাশার কোনও লাভ নেই। বরং বিষ্টি হলে তার শো হবে না। বিষ্টি দেখে তিনি নিজেও খুব মনখারাপ করেছিলেন। তাঁরই তো ক্ষতি। আজ হাটের দিন, আজ অনেক দূর থেকে সবাই আপনারা আসবেন, বিষ্টি এনে নিজের শো নষ্ট করে তাঁর লাভ কী?'

এ-কথার জবাব কেউ দিতে পারল না। এবারে সবাইকে উশখুশ করতে দেখা গেল বেরিয়ে যাবার জন্য। মাথা নিচু করে ফেলেছে জনতা। যে-বুড়োটা স্টেজের কাছে এসেছিল সে আমতা আমতা করতে লাগল।

'আপনারা বলছিলেন প্রফেসর নাজিম পাশা লুকিয়ে আছেন। মিথ্যে। তিনি আপনাদের সামনেই আছেন। দেখুন।' আল্লারাখা থামার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্টেজে এসে দাঁড়ালেন প্রফেসর। তার পেছনে চম্পা। চম্পার পর জহির, সামাদ, ব্যান্ডপার্টির চারমূর্তি।

জনতা হাততালি দিয়ে উঠল একসঙ্গে। হাসিতে ঝলমল করে উঠল প্রত্যেকের মুখ। তরঙ্গের মতো উঠতে পড়তে লাগল হাততালির শব্দ। উল্লাসে মুখরিত হয়ে উঠল টাউন হল।

'দেখুন, এটা কী?'

'গোলাপ।' শ–খানেক কণ্ঠ উত্তর দিল একসঙ্গে।

আল্লারাখার হাতে একটা গোলাপ। লাল, তার ভারি সুগন্ধ, বিরাট। একমুহূর্ত আগে গোলাপটা কোথাও ছিল না, সে একবারও হাত পকেটে ঢোকায়নি তবু কোত্থেকে তার হাতে এল কেউ ভাবল না। যেন সারাক্ষণই ওটা তার সঙ্গে ছিল। তখন আল্লারাখা চম্পার কপালের ওপর লুটিয়ে পড়া আধখানা চাঁদের মতো চুলের গুচ্ছ স্পর্শ করল— আরেকটা গোলাপ বেরিয়ে এল সেখান থেকে।

হাততালি দিয়ে উঠল জনতা। এবারে আরও প্রবল। চমকে উঠল চম্পা। এ কী! তার সারাশরীর একনিমিষে গোলাপের সুবাসে ভরে উঠেছে। বিস্ময় নিয়ে সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল আল্লারাখার দিকে।

আল্লারাখা তখন প্রফেসরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্রফেসর একবার বিব্রত হয়ে হাসতে চেষ্টা করলেন। সে বলল, 'আপনার কাছেও অনেক গোলাপ আছে। দিন। এরা অনেকদূর থেকে এসেছে। খুশি হবে। তবেই তো ওরা জানবে, আপনি ওদের ভালো চান!' প্রফেসর প্রতিবাদ করতে উদ্যত হলেন। তাঁর পকেটে গোলাপ আসবে কোত্থেকে!

তখন আল্লারাখা 'মাপ করবেন' বলে প্রফেসরের পকেটে হাত ঢোকাল এবং বের করে আনল একমুঠো গোলাপ। রক্তের মতো টকটকে লাল, তাজা; যেন এইমাত্র বাগান থেকে তুলে আনা হয়েছে। সুগন্ধে ভরে গেল সারা স্টেজ। চাঁদের মতো জ্বলজ্বল করে উঠল আল্লারাখার মুখ।

হঠাৎ লোকটা যেন খ্যাপা হয়ে গেল। পাগলের মতো যেখানে হাত দিল সেখান থেকেই বেরুল গোলাপ। সে গোলাপ ছুড়ে দিতে লাগল জনতার মধ্যে। একশো, দুশো, তিনশো, শত শত। তার যেন আর শেষ নেই। চেয়ার, টুল, দরজা, চুল, কান, আস্তিন, মেঝে— সারা হল থেকে বেরুচ্ছে গোলাপ। জনতার মধ্যে নেমে এসে সবার শরীর স্পর্শ করছে আল্লারাখা, আর বেরিয়ে আসছে গোলাপ। সবার হাত ভরে গেল, পকেট উপচে উঠল, সারা হল সুগন্ধে ম ম করতে লাগল— তবু শেষ হল না গোলাপের। বিদ্যুৎগতিতে চলছে আল্লারাখার দশ আঙুল, যেন একসঙ্গে অনেকগুলো পাখির ডানা ঝটপট করছে আর তা থেকে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে রক্তগোলাপ।

সে রাতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে লোকেরা বলাবলি করল— দু হাজার। অনেকে বলল, কম করে হলেও চার হাজার গোলাপ। তারা বাড়ি পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে সে সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল দশ হাজারে। সারারাত ধরে চলল তাদের মধ্যে এই আলোচনা। গর্বের সঙ্গে প্রত্যেকে দেখাল তাদের বাড়ি নিয়ে আসা একেকটা গোলাপ। দশ হাজার গোলাপ তারা দেখে এসেছে।

কিন্তু একমাত্র আল্লারাখা ছাড়া আর কেউ জানে না, আসলে সে মাত্র সাতশো ছিয়াশিটি গোলাপ এনেছিল।

লোকেরা কেউ একটা দুটো পাঁচটা যে যেমন পেরেছে গোলাপ নিয়ে এসেছে বাড়িতে, তাদের বউকে ছেলেমেয়েকে পড়শিকে দেখাবে বলে। কিন্তু সবাই ভাগ্যবান নয়, সবাই আনতে পারেনি। কেবল যারা প্রথম এসেছিল তারা পেয়েছে। বিদ্যুতের মতো

ছড়িয়ে পড়েছিল গোলাপের খবর সারা শহরে, আর দলে দলে লোক চারদিক থেকে এসে ভিড় করেছিল টাউন হলের দরজায়। সে রাতে প্রফেসর নাজিম পাশাকে দুটো শো করতে হয়েছিল। একেকটা শো ছিল লোকে লোকারণ্য; কত লোক প্যাসেজে, পেছনে, দরজায় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে খেলা দেখে গেছে। ক্যাশবাক্স ভরে উঠেছে পয়সায়, চম্পাকে দু-বার এসে ট্রাঙ্ক খুলে ক্যাশবাক্স ঢেলে খালি করতে হয়েছে। টিকেট ইস্যু করতে করতে সামাদের আর পটকার হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে। সবাই গোঁ ধরেছে— আমরাও গোলাপ চাই।

কিন্তু আল্লারাখা জানে একদিনে সাতশো ছিয়াশিটির বেশি গোলাপ সে বের করতে পারবে না। স্বপ্ন, বাস্তব, মায়া, বিভ্রম, বস্তু সবকিছুরই একটা সীমারেখা কোথাও-না কোথাও আছে— আল্লারাখারও তাই। সে বলল, কাল সে আবার গোলাপ দেবে সবাইকে। লোকেরা তখন চেপে ধরল, কাল শো করতে হবে প্রফেসরকে। প্রফেসরের আজকেই ছিল এ শহরে শেষ প্রদর্শনী, কিন্তু তিনি রাজি হয়ে গেলেন। প্রফেসর দত্ত-র দল থেকে বেরিয়ে এসে নিজে দল করে আজ অবধি একরাতে এত টাকার টিকেট বিক্রি আর কখনও হয়নি। এবার ইসলামপুরে রহমান দর্জির সুট-কাটা বাবদ মজুরি তিনি শোধ করতে পারবেন, জিনিসপত্র বানিয়ে আরও কয়েকটা নতুন আইটেম ঢোকাতে পারবেন শো-এ, চম্পাকে আসল সোনার গয়না বানিয়ে দিতে পারবেন। আজকাল সিনেমার পাল্লায় পড়ে ম্যাজিকের মজা কমে গেছে লোকের কাছে। কিন্তু আজকের কাণ্ড দেখলে কে বলবে সে কথা? জনতাই দাবি করছে অতিরিক্ত শো-এর, লোক হলে কুলানো হচ্ছে না, দূর দূর গাঁ থেকে মানুষ পিঁপড়ের মতো আসতে শুরু করেছে, দাবি করছে আরও একদিন শো করতে। আল্লারাখা স্টেজে দাঁড়িয়ে বলল, কাল আবার সবাইকে গোলাপ দেবে সে। লোকেরা শুনে খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

জহির নাক কুঁচকে বলল, 'মেসমেরিজম! সব মেসমেরিজম! এর আবার কেরামতি কী? ছোঃ।'

চম্পা পাল্টা আক্রমণ করল, 'তো হয়েছে কী? হলই-বা মেসমেরিজম!'

জহির তার ঠোঁটে কামড়ের জ্বালাটা ভুলতে পারেনি তখনও, তার ওপরে চম্পার আল্লারাখার দিকে টেনে কথা বলা! থুক করে সে থুতু ফেলে বলল, 'তুই তো বলবিই। তোর বাপের ট্যাঁকে পয়সা উঠেছে কিনা! বাপের ব্যাটা হয় হাতের গুণে হয়কে নয় করুক, বুঝি তা হলে। মেসমেরিজম করে কারদানি। ও করলে আমিও এক্ষুনি ধানের ক্ষেতে জাহাজ চালাতে পারি।'

'চালাও না দেখি।' চম্পা বিদ্রূপ করে বলল।

'তোর কথায় আর কী! ওস্তাদের নিষেধ আছে। বাহাদুর হও তো নিজের দু-খান হাত দিয়ে খেল্ দেখাও। মেসমেরিজম তো ছোট জাতের কারবার! বাপ-বেটিতে তাই দেখেই চিত্তির!'

তার কথা বলার ধরন দেখে হি হি করে হেসে উঠল চম্পা। বুঝল খুব হিংসে হয়েছে জহিরের। একটা কিছু যে তাকে কাবু করতে পেরেছে এইটে মনে করে চম্পার ভেতরটা খুশিতে লাফিয়ে উঠল। তাকে খানিকটা খোঁচাতে, খানিকটা মজা করতে হাত বাড়িয়ে বলল, 'বুঝলাম। সিগ্‌রেট দেখি এবার।'

গরগর করতে করতে জহির একটা সিগারেট বার করে দিল। এরকম আকস্মিক মোড় নেবে কথার তা সে ভাবতে পারেনি। কেমন আমতা আমতা করতে লাগল। নিজের ওপরেই রাগ হল ভীষণ। তার ওপর ঠোঁটের নিচে দাঁতের দাগ এখনও কালো হয়ে আছে।

আগুন নেভাতে গিয়ে চম্পাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল আচমকা। চম্পা নিচুগলায় গর্জন করে উঠল, 'ছাড়ো।' কিন্তু ছাড়ল না জহির। তারা দাঁড়িয়ে ছিল স্টেজের পেছনে ঝোলানো কালো পর্দার নিচে। সেখানে অন্ধকারে দুম করে একটা শব্দ হল শুধু। কাঠের পাটাতনের ওপর ভারী দুটো শরীর পড়ে যাওয়ার শব্দ হল। জহির তাকে বুকে চেপে ধরে গড়াতে গড়াতে কালো পর্দার ধুলোভর্তি ভ্যাপসাগন্ধ ভাঁজের নিচে সেঁধিয়ে গেল। চম্পা থেকে থেকে 'ইশ, 'ইশ' করছিল আর যখনি জহির গড়াতে গড়াতে একেবারে তার বুকের ওপর উঠে পড়ছিল তখন মনে হচ্ছিল পাঁজর ক-খানা যেন গুঁড়িয়ে যাবে।

'ছাড়ো, ছাড়ো বলছি।'

'চুপ।'

মুখ চেপে ধরল তার জহির। তার পর মাত্র একটা অস্বস্তিকর মুহূর্ত। চম্পার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে গেল সেই মুহূর্তে। সারাশহর আজ বিকেলের হঠাৎ বৃষ্টিতে যেমন হয়ে গিয়েছিল, অবিকল তেমনি। একবার শুধু জহির দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল, 'দ্যাখ কাকে বলে মেসমেরিজম! চম্পা, তুই আমার বউ হবি?'

চম্পা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে দেখল আল্লারাখা প্রফেসরের সমুখে নতমুখে বসে আছে। ব্যান্ডপার্টির চারমূর্তি রান্না করতে লেগেছে। ছোট সাকরেদ সামাদ বসে বসে জিনিসের লিস্ট মেলাচ্ছে। প্রতি শো-এর পর ওর হচ্ছে এই কাজ। তার কাছেই বসল চম্পা। বলল, 'দে আমাকে, আমি দেখছি।' সামাদ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। তার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'শুনলাম, ওই লোকটাকে দলে নেয়া হল।'

'কে?'

'ওই যে গোলাপ! ওস্তাদ বলতেই রাজি হয়ে গেল। দল ভাঙতে এসেছে কিনা বুঝতে পারলাম না।'

'কেন?'

'ফট করে রাজি হয়ে গেল কিনা। অনেকে ওরকম খেলা শিখে নিয়ে শেষে বারোটা বাজায়। নিজে দল করে। কাজটা বোধহয় ভালো করলেন না ওস্তাদ।'

চম্পা একটুও অবাক হল না আল্লারাখাকে তার বাবা দলে নিয়েছেন শুনে। সে-যে দল একদিন ভাঙতে পারে সে সম্ভাবনাও তাকে বিচলিত করতে পারল না। সামাদ এসব বলে-কয়ে চম্পার একটু ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে, নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছে, দলের একজন বলে দুর্ভাবনার দাবি দেখাচ্ছে— সেটাও চোখে পড়ল না চম্পার, সে বসে বসে জিনিসের লিস্ট মেলাতে লাগল। চম্পার মন ছিল না এখানে, কিংবা কোনোখানে। নিজে নিজে সে জানতেও পেল না, একটা বিরাট হাই তুলল চম্পা।

আল্লারাখা খেল অত্যন্ত অল্প। প্রফেসর তাকে খেতে খেতে তুলে দিচ্ছিলেন, কিন্তু ফিরিয়ে দিল সে। ব্যান্ডপার্টির চারমূর্তি অবাক হল, একটা মানুষ এত কম খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে কী করে? এ যে একেবারে পাখির আধার! তা হোক, বাঁচলে পেট পুরে খেতে পারবে খাড়ানাক, বোঁচানাক, পটকা আর চালকুমড়ো। সবার পরে ওরা খেতে বসবে।

শোবার কিছু সঙ্গে নেই, প্রফেসর তাকে কালো আলখাল্লাটা বিছোতে দিলেন আর একটা বালিশ। চম্পার বদঅভ্যেস, দুটো বালিশ না হলে ঘুমোতে পারে না— তার একটা। একঘরে থাকত সামাদ আর জহির। সামাদকে ব্যান্ডপার্টির সঙ্গে শুতে বলে আল্লারাখাকে তার জায়গায় যেতে বললেন প্রফেসর। কিন্তু সে উত্তর করল, 'এইটুকু রাত !' এই বলে সে বালিশ নিয়ে স্টেজের এককোণে শুয়ে পড়ল।

আস্তে আস্তে শেয়ালের ডাকে সাহস ফিরে এল। তারা দল বেঁধে হাঁটতে লাগল বড় সড়কে— দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে বাঁশবনের এপার ওপার করতে লাগল, যেন এটা এদেরই রাজত্ব। চোখ জ্বলতে লাগল যেন কোনও জ্ঞানী মানুষ মজার ব্যাপার দেখে হাসছে। রাত চৌকিদারেরা ঘুমিয়ে পড়ল লাঠি হাতে টর্চ কোমরে গুঁজে পথের এখানে-ওখানে বসবার জায়গা খুঁজে নিয়ে। রেলইয়ার্ডে পানির ট্যাঙ্ক থেকে টপ্‌টপ্ টপ্‌টপ্ করে পানি পড়তে লাগল। একটা রাস্তা— যার এ-মাথায় ঘুম আর ও-মাথায় জাগরণ— আল্লারাখা একবার শেষ অবধি গিয়ে আবার ফিরে এল এ-মাথায়, আবার গেল আবার ফিরে এল, মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল, আবার চলতে লাগল, গেল, ফিরে এল, গেল, আবার ফিরে এল।

বালিশে মৃদু সুবাস। অনেক রাত ধরে পরতে পরতে জমেছে, জড়িয়ে গেছে। দু-একটা দীর্ঘ চুল লেগে আছে এখনও। আল্লারাখার ঘুমন্ত গালের নিচে সেই চ্যুত চুলগুলো যেন শিরশির করে নদীর মতো সচল হয়ে উঠেছে। আর সেই সুবাস, বোঝা যায় কি যায় না, হয়তো নেই। কোনও ফুল, গাছ, পাতা, কারও নয়। বোধহয় এরকম সুবাস থেকে আসে তার গোলাপের সুগন্ধ? আল্লারাখা আবার সেই রাস্তাটা দিয়ে বিহ্বলের মতো চলতে থাকে।

চোখ খুলে দেখল মাথার ওপর ঝুঁকে পড়ে চম্পা দাঁড়িয়ে আছে। আর চম্পা দেখল, স্টেজের এককোণে, ধুলোভর্তি পাটাতনে কুকুরের মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে লোকটা। আল্লারাখা তখন তার বালিশের পরতে পরতে জড়ানো সুবাসের কথা জানতে পারল। চম্পার তখন মনে হল, লোকটার মতো একা আর কেউ নেই— এ একাকীত্ব এত নিবিড় যেন একটা জামা, যা গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে আল্লারাখা। তাই তার ইচ্ছে করলেও সে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না তার দিকে। স্পর্শ করতে পারল না, কথা বলতে পারল না। চম্পার মনে হল, তার ঘুমের ভেতর থেকে তাকে ডেকে এনেছিল লোকটা, এখন কাজ হয়ে গেছে, এখন সে যেতে পারে। সে চলে গেল। তখন আল্লারাখা হাঁটতে হাঁটতে সেই রাস্তার শেষ মাথায় ঘুমের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সারারাতে আর একবারও ফিরে এল না।

কুড়িগ্রামে একদিনের বদলে আরও তিন দিন শো করতে হল প্রফেসর নাজিম পাশাকে। এখন তার শো-এর সব সেরা ও শেষ আইটেম : রক্তগোলাপ। ডাকবাংলোর রাস্তায় যেতে পড়ে ছবিঘর, সেটা প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়, সবাই আসছে টাউনহলে ম্যাজিক দেখতে। রাতারাতি গজিয়ে গেছে চা-পান-বিড়ির দোকান। লোক আসছে বন্যার মতো— নাগেশ্বরী, ভোগডাঙ্গা, পলাশবাড়ি, কালিগঞ্জ, কাঁঠালবাড়ি, রাজার হাট, সিন্দুরমতি— কোনও গ্রামের আর কেউ বাকি রইল না! লালমনিরহাটে বায়না হয়েছিল, কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিন দিনের দিন রওনা হতে হল। পর পর বায়না রয়েছে রংপুর, নীলফামারী, বামনডাঙ্গা, গাইবান্ধা, বগুড়া, শেরপুর হয়ে পাবনা, উল্লাপাড়া আর সিরাজগঞ্জে।

এর মধ্যে চম্পার জেদে নাম পাল্টাতে হয়েছে আল্লারাখাকে। সেই বৃষ্টি-বিকেলের পরদিনই। নাম শুনে হি হি করে হেসেছিল চম্পা, নতুন নাম দিতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল সে। অবশেষে প্রফেসরই বাঁচালেন। দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। হঠাৎ জেগে উঠে হাঁকডাক শুরু করে দিলেন, 'চম্পা, চম্পা হয়ে গেছে।'

চম্পা দৌড়ে এসে শুধাল, 'কী বাবা, কী হয়ে গেছে?'

প্রফেসর বললেন, 'নাম। ঘুমিয়ে আছি,স্বপ্ন দেখলাম, যেন একটা ভারি সুন্দর জায়গায় চলে গিয়েছি, বুঝলি? লোকে বলল, এটা বেহেশ্‌ত। জান্নাত। হঠাৎ দেখলাম একটা বাগান। হাজার হাজার গোলাপ। হাসছে, ঝলমল করছে, লাল রঙটার ভেতর থেকে আলো বেরুচ্ছে যেন। আর কস্তুরীর মতো ঘ্রাণ। চম্পা, এরকম অবাক কাণ্ড জীবনে দেখিনি। যখন তুই মায়ের পেটে, তখন তোর মা এরকম স্বপ্ন দেখেছিল।' বলতে বলতে গাঢ় হয়ে এল তার কণ্ঠ, উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ। তিনি বলে চললেন, 'আমাকে জাগিয়ে তুলে তোর মা বলল, আমি বেহেশ্‌ত দেখলাম স্বপ্নে। বলল, যদি ছেলে হয় নাম রাখব ফিরদৌসি। চম্পা, বেহেশতকে ফিরদৌসও বলে কিনা, তাই ও নামটা পছন্দ হয়েছিল তার।'

চম্পা বলল, 'তার বদলে হলাম আমি। মা কী বলল তখন?'

'তোর মার কি আর পরে মনে ছিল? বলে, আমারই ছিল না। ফুটফুটে দেখে তোর নাম রাখলাম চম্পা। হঠাৎ আজ মনে পড়ল। কী আশ্চর্য! আল্লারাখার নাম নিয়ে সকালে এত জল্পনা করলি। নাম রেখে দে ফিরদৌসি। কী বলিস? ওর খেলার সঙ্গে মানাবে ভালো।'

তাঁর স্ত্রী যে-নামটা একদিন পছন্দ করেছিলেন সেটা কাউকে দিয়ে দিতে যেন সংকোচ করছে। যেন ঘরের জিনিস না-বলে না-কয়ে দান করে দিচ্ছেন। চম্পার মুখের দিকে তাই উদগ্রীব হয়ে তাকালেন তিনি। যেন চম্পা বললেই নিজের আর অপরাধ থাকে না। চম্পা বলল, 'চমৎকার! কী যে নাম রেখেছিল ওর বাপ-মা, হাসি পায়, না বাবা?'

চম্পা নিজেই গিয়ে খবরটা দিয়ে এল আল্লারাখাকে। বলল, 'আজ থেকে ফিরদৌসি বলে সবসময় ডাকা হবে। ডাকলে যেন সাড়া পাই।'

'আচ্ছা। বেশ নাম।' আল্লারাখা তখন কোথা থেকে চামড়া এনে কালকের পুড়ে-যাওয়া ড্রাম মনোযোগ দিয়ে মেরামত করছিল।

সে-রাতের শো-এ সমস্ত আইটেম যখন শেষ হয়ে গেল, তখন প্রফেসর নাজিম পাশা স্টেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার তালি দিলেন, তার পর ঘোষণা করলেন, 'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের শেষ আইটেম— রক্তগোলাপ।' করতালিতে ভরে উঠল টাউনহল। 'সাত আসমান আর দো-জাহানের লাখো কুদরৎ-এর এক কুদরৎ রক্তগোলাপ।' একটানা উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করে যেতে লাগলেন প্রফেসর নাজিম পাশা, 'সারা দুনিয়ার বড় বড় জাদুকর, বড় বড় ম্যাজিশিয়ান, বড় বড় কুদরতি কামেল পর্যন্ত এ খেলার সন্ধান জানে না। শত শত বছরে একজন— মাত্র একজনকে এই অদ্ভুত মায়াশক্তি দেওয়া হয়। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য— রক্তগোলাপ। বাগান লাগে না — গাছ হয়; পানি লাগে না— বড় হয়; দুনিয়ার সাত ভেজালে বাঁধা চোখ দিয়ে সে ফুল দেখা যায় না। সেই ফুল, সেই রক্তগোলাপ দেখাবেন আজ আমার প্রিয় সাকরেদ ফিরদৌসি।' ব্যান্ড পার্টি

প্রবল বিক্রমে শুরু করল বাজনা, শ্বাসরুদ্ধ করে বসে রইল দর্শক। প্রফেসর বাজনার তালে তালে বলে চললেন, 'ফিরদৌসি— আমার প্রিয় সাকরেদ— রক্তগোলাপ। ভাগ্যবানেরা একটি করে পাবেন— বাড়ি নিয়ে যাবেন— খোশবুতে ভরে উঠবে ঘর। বিলাত থেকে লোক এসেছিল, আমেরিকা লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিল, জাপান হাওয়াই জাহাজ পাঠিয়েছিল, তবু আমার সাকরেদ ফিরদৌসি তার দেশ ছেড়ে যায় নাই। বন্ধুগণ, টাকা দিয়ে কেনা যায় না, সাধনা করে পাওয়া যায় না, সাত আসমান আর দোজাহানের লাখো কুদরৎ-এর এক কুদরৎ রক্তগোলাপ।'

স্টেজে এসে তখন দাঁড়াল ফিরদৌসি। নীরবে নত হয়ে সালাম করল। পরমুহূর্তেই হাত যেন রূপান্তরিত হল বিদ্যুতে। ঝড়ের মতো উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল গোলাপ, বৃষ্টির মতো পড়তে লাগল গোলাপ, ঝর্নার মতো নাচতে লাগল অসংখ্য গোলাপ। করতালিতে মুখর হয়ে উঠল হল।

কুড়িগ্রাম থেকে ডেরা তুলবার আগে প্রফেসর আবার তার প্ল্যাকার্ড আঁকিয়ে নিয়েছেন ওখানকার একমাত্র সাইনবোর্ড লিখিয়ে জীবন রায়কে দিয়ে। এবারে প্ল্যাকার্ড আরও বড় করা হয়েছে। তার মাথায় এবার আঁকা হয়েছে ফিরদৌসি আর রক্তগোলাপের চিত্র। পয়সা নামমাত্র নিয়েছেন জীবনবাবু; পরিবার নিয়ে সামনের সারিতে বসে সেকেন্ড অফিসার, সার্কল অফিসারদের সঙ্গে শো দেখতে পেয়েছেন পাশে, তাতেই খুশি। ফিরদৌসি তাঁকে একটা বড় গোলাপ দিয়েছিল স্টেজ থেকে নেমে এসে, সেইটে দোকানে রেখেছেন তারপিনের খালি শিশিতে পানি ভরে, জিইয়ে। রাস্তার লোক ধরে ধরে গল্প করলেন ক-দিন, 'বুঝলে হে! সবাইকে ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছিল, আমাকে দেখে একেবারে নেমে এসে— দেখছই তো কতবড়, এতবড় আর কেউ পায়নি।'

লোকেরা তাজ্জব হয়ে দেখে আর মাথা নাড়ে। কেউ কেউ হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখে। বলে, 'একেবারে সত্যি গোলাপ হে! সেইটেই আশ্চর্য। রোজ রোজ এত গোলাপ আসে কোত্থেকে?'

উত্তর দিতে পারে না কেউ। নানারকম গুজব। একেকজন একেক কথা বলে। কিন্তু কারও কথাই কাজের মনে হয় না। সবাই চোখ চাওয়াচাওয়ি করে। সত্যিই তো, এত গোলাপ আসে কোথা থেকে? যতই বলুন প্রফেসর নাজিম পাশা, বাগান লাগে না— গাছ হয়, লোকেরা মনে মনে কল্পনা করতে থাকে মাইল দু মাইল জুড়ে এক বিরাট বাগানের।

দলের কাছেও এ এক বিরাট রহস্য। ফিরদৌসির গুণটা কোথায়? প্রথম ক-দিন কেউ তাকে জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না। সাহস ঠিক নয়, সুযোগ হয় না। বলতে গেলে কারও সঙ্গে কথাই বলে না ফিরদৌসি। কখন বসে একটুখানি খেয়ে নেয়, সারাদিন একটা পাতা কি কাঠি কি ফড়িং যা পায় তুলে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখতে থাকে; যেন এই প্রথম দেখছে। শো-র সময় আরেক কাণ্ড— পোশাক পরবার পর থেকে হাত-পা কাঁপতে থাকে, ভীষণ ভয় করতে থাকে তার, ঠোঁট শুকিয়ে যায়, তার পর খেলা দেখিয়ে মরা একটা মানুষের মতো গা হাত পা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে থাকে সংকুচিতভাবে চোরের মতো বারান্দায় কি স্টেজের এক কোণায় বিছানা পেতে— একটু ভালো ঘর, বিছানা, খাওয়া দিতে গেলে বা কেউ কথা বললে বিব্রত হয়ে পড়ে, বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এ মানুষকে জিজ্ঞেস করাও ঝকমারি। ক'দিন সবাই চোরা-নজরে রাখে ওকে, যদি রক্তগোলাপের হদিস পাওয়া যায়। তাতেও কোনও লাভ হয় না। এক মুহূর্তের জন্যেও কোথাও যায় না ফিরদৌসি, চোখের

আড়াল হয় না। সামাদ একদিন সারারাত জেগে পাহারা দিয়েছে। নাহ্, ঘুম থেকে একবারও কোথাও উঠে যায়নি ফিরদৌসি। জহির, যে জহির প্রথমদিন মেসমেরিজম বলে তুচ্ছ করেছিল, ভাবনায় পড়েছিল সেও। আসলে সেও বুঝতে পেরেছে, এ মেসমেরিজমের কর্ম নয়। তাহলে গুণটা কোথায় ফিরদৌসির?

ক-দিন পরে দলে যখন একটু পুরনো হল ফিরদৌসি, তখন খুচরো জিজ্ঞেসাবাদ করা হল। কখনও সামাদ, কখনও ব্যান্ডপার্টির চারমূর্তি, কখনও জহির। দলের পসার বেড়ে গেছে ফিরদৌসি যোগ দেওয়ার পর, নতুন বায়না রোজ আসছে, জহিরের এটা সহ্য হত না। ফিরদৌসির দিকে তার তাচ্ছিল্য দিনে দিনে তাই বাড়ছিল, আর মনে মনে ভাবছিল গুণটা জেনে নিতে পারলে ঘাড় ধরে নাবিয়ে দেয়া যেত রাস্তায়। জহির একে ওকে লাগায়; তাদের প্রশ্ন শুনে ফিরদৌসি ম্লান হাসে, বিব্রত হয়ে এদিক-ওদিক তাকায় যেন এদের ভাষাটাই সে বুঝতে পারছে না। চম্পার জন্যে মনটা তার কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে, কারণ চম্পা তাকে জিজ্ঞেস করে না, তার গোলাপ দেখে অবাক হয় না। ফিরদৌসি যেন বুঝতেই পারে না, তার গোলাপ দেখে এত অবাক হওয়ার কী আছে!

এদিকে আরেক ব্যাপারে, শান্তিটুকু বলতে নেই জহিরের। সেদিন সেই রাতের পর চম্পা তাকে দশ হাতের মধ্যে আসতে দেয় না। চম্পাকে আর একা পাওয়া যায় না। রক্তে যে আগুন ধরেছে সে রাতে, থেকে-থেকে তা জহিরকে এমন করে পোড়ায় যে, মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে যায়। তখন মোদক দু-চার দলা মুখে না দিলে শরীরটাতে আর ঝিম আসে না। কেন যেন তার সব রাগ গিয়ে আরও বেশি করে পড়ে ফিরদৌসির ওপর। সে আসার আগে বেশ ছিল সব।

একদিন প্রফেসরকে বলেই ফেলল জহির, 'ওস্তাদ, আমরা নাহয় ফ্যালনা চ্যালা। আপনাকে তো গোলাপের গুণ বলতে পারে। আমরা নাহয় দেমাক সইলাম, আপনাকে-যে ব্যাটা অপমান করছে, এটা আমাদের সহ্য হয় না। সাচ্চা সাকরেদ হয়, বলুক সব খুলে আপনাকে।'

প্রফেসর তাকে শান্ত করলেন বুঝিয়ে। নিজেও ভাবলেন,— সত্যি তো, আমাকে অন্তত ফিরদৌসির বলা উচিত। পুরনো সাকরেদ জহির, তার দিকে টান আছে বলেই না, যে-কথা তিনি খেয়াল করেননি, সেটা মনে করিয়ে দিয়ে গেল।

তখন শো হচ্ছিল নিলফামারীতে। এক রাতে শো-শেষে ফিরদৌসিকে নিজের ঘরে ডেকে এনে দোর বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার গুণটা আজ আমাকে বলো। আর কিছু না।'

ফিরদৌসি অবাক হয়ে চোখ তুলল। যেন এতদিন ধরে ফিসফাস চলছে তার বিরুদ্ধে এইটে সে বুঝতে পেরেছে।

'ফিরদৌসি।'

'জী?'

'বলো।'

চুপ করে রইল সে। তখন প্রফেসর তার কাঁধে হাত রেখে অভয় দিলেন, 'এখানে কেউ নেই। কেউ জানবে না। আমি কসম করছি ফিরদৌসি, কাউকে বলব না তোমার গুণ। বলো।'

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন প্রফেসর। তবু কোনও জবাব নেই। তখন অন্য পথ ধরলেন, 'দ্যাখো ফিরদৌসি, আমাকে তুমি ওস্তাদ মানো?'

'জী।'

'দলে নেবার সময় তোমাকে হাতে ধরে সাকরেদ করেছিলাম?'

'জী।'

'ওস্তাদকে না-বলা, তার কথার অবাধ্য হওয়া ভালো?'

চৌকির ওপর বসে বসে ঘামতে লাগল ফিরদৌসি। বিছানার ওপর প্রফেসরের জাদুর লাঠিটা পড়েছিল, খামোকা সেটা নাড়তে লাগল— মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল তার গায়ে নানা রঙের আংটিগুলো। বুক ফেটে যেতে লাগল ফিরদৌসির। কিন্তু কথা বলতে পারল না।

তখন প্রফেসর নিরাশ হয়ে তার শেষ অস্ত্র ছাড়লেন। বললেন, 'আমার শো-এর সব খেলার গুণ আমার জানা। এ না হলে দল চলে না। জহির, সামাদ, চম্পা— এরা সবাই আমার হাতে-গড়া আর্টিস্ট। সবাই আমাকে জানাতে বাধ্য। তোমার বেলায় এতদিন জানতে চাইনি, ভেবেছিলাম নিজেই বলবে। তোমার জীবন বাঁচিয়েছিলেম একদিন, কিন্তু এতদিন হয়ে গেল, এখনও যদি না বলো আর চলে না। দলের সবাইকে আমি বলব কী?'

উৎকর্ণ হয়ে প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, কী বললে?' একটা উত্তর দিয়েছিল ফিরদৌসি। আবার সে বলল, তেমনি অস্ফুট স্বরে, 'তাহলে, আমি বরং চলেই যাই।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন প্রফেসর। বলে কী! চলে যাবে! একটা কথা বলতে পারলেন না। তাঁর মনে হল, ডান হাতখানা কে কেটে নিয়ে গেছে। চোখের সুমুখে লাফিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠল আবার সেই ছবি— হলে দর্শক নেই, দু বেলা শুধু খিচুড়ি, পোশাকে তালির পর তালি পড়ছে, ট্রেনের টিকেটের পয়সা নেই। ফিরদৌসি আসার পর গত দু মাসে পসার এত বেড়েছে, পয়সার ঝনঝন এত দীর্ঘ হয়ে উঠেছে যে, সে চলে যাবে, যেতে পারে, এটা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। স্বপ্ন ছিল পশ্চিম পাকিস্তান যাবেন, ইরান-তুরান যাবেন, বিলাত আমেরিকায় শো করবেন, পাল্লা দেবেন পি.সি. সরকারের সঙ্গে— সব যেন দপ করে নিভে গেল ফিরদৌসির একটামাত্র কথায়।

ফিরদৌসি আস্তে আস্তে চৌকি ছেড়ে উঠে দরজা খুলে, বাইরে মধ্যরাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। অসহায়ের মতো বোবা চোখে তাকিয়ে দেখলেন প্রফেসর নাজিম পাশা।

চম্পা এ-ঘরে এসেছিল, অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াল। বাবা নিঃশব্দে কাঁদছেন। বসে আছেন চৌকির ওপর, দুটো হাত হাঁটুর ওপর রাখা, কেঁপে কেঁপে উঠছে সারাশরীর। বাবাকে আজ কাঁদতে দেখে সত্যি সত্যি অবাক হল চম্পা। কারণ বাবা গত দু মাসে একদিনও কাঁদেননি। চম্পা ভুলে যেতেই বসেছিল বাবার ওই শিশুর মতো কান্নার স্বভাবকে। আজ যেন তার নিজের অশ্রুও ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। বড় দুর্বল মনে হল নিজেকে। মনে হল, তার কেউ নেই। আর দাঁড়াতে পারল না সেখানে, দেখতে পারল না বাবাকে; চৌকাঠের বাইরে এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল চম্পা।

পটকা বিছানা বগলদাবা করে শুতে যাচ্ছিল, চম্পাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী?' চম্পা তখন ম্লান হেসে উত্তর দিল, 'না রে, কিছু না। তুই ঘুমোগে। বড্ড গরম পড়ছে।' চলে গেল পটকা। তখন আরও একা লাগল চম্পার। আস্তে আস্তে প্রাণহীনের মতো বসে পড়ল সে টুলের ওপর। শেষ হ্যাজাকটা জ্বলছিল শেষপ্রান্তের কামরায়— ওদের শো হচ্ছিল হাইস্কুলে আমের বন্ধে— জহিরদের। যেন লাফিয়ে

পড়ল তৎক্ষণাৎ চারিদিকের ওঁৎ পেতে থাকা অন্ধকার। স্কুলের সামনে বিরাট জামরুল গাছের পাতা সরসর করতে লাগল। দূরে একটা লিচু গাছে ঢন্ ঢন্ করে বাজতে লাগল বাদুড়-তাড়ুয়া টিন। একটা কুকুর রাস্তার ওপর বেরিয়ে এসে চারদিক দেখল, মাটি শুঁকল, তার পর জ্বলজ্বল কোটি কোটি তারার দিকে মুখ তুলে অবিকল মানুষের বাচ্চার মতো কেঁদে উঠল।

ঘুমের মধ্যে জেগে উঠল চম্পা। বালিশ থেকে মাথা তুলে দেখে, বাবা তাঁর চৌকিতে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। নিচে মাটিতে রাখা হ্যারিকেন জ্বলছে চোখ বুজে। আর কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু তবু কে যেন তাকে ডাকছে; শোনা যাচ্ছে না, বুকের ভেতরে ঠেলে ঠেলে উঠছে নিশ্বাস।

স্কুলের প্রায় সবগুলো দরজাই খোলা। অন্ধকারে তারা হাঁ করে আছে এক অমিত ক্ষুধা নিয়ে। তাদের প্রত্যেকের সামনে বাতি নিয়ে দাঁড়াল চম্পা। এ-ঘর সে-ঘর খুঁজল, কিন্তু পেল না। লম্বা বারান্দায় কাঠের থামগুলো একের পর এক পেরিয়ে এসে নিরাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চম্পা। আবার কেঁদে উঠল সেই কুকুরটা। আবার ঠেলে ঠেলে উঠল নিশ্বাস। আবার খুঁজল চম্পা। তখন পেল। একেবারে মুখের পরে মুখ রেখে ফিসফিস করে ডাকল, 'ফিরদৌসি।'

সে শুয়ে ছিল একা একটা ঘরে, শানের ওপর, জড়সড় হয়ে। মাথা থেকে সরে গেছে বালিশটা। বুক অবধি পা-দুটো টেনে পড়ে আছে সে।

সেই রাস্তায় ঘুমের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়েছিল ফিরদৌসি। হঠাৎ বিহ্বলের মতো চলতে শুরু করল সে। মাঝপথে এসে থামল, বুঝতে পারল না কোন্‌দিকে যাবে। ফিরে যাচ্ছিল, আবার থামল। তার পর এ মাথায় এসে দেখতে পেল চম্পাকে, চম্পার নতমুখে একগুচ্ছ চুল। বলল, 'চম্পা, আমি যাব না। আমি যাব না। আমি যাব না।'

তার কপালে হাত রাখল চম্পা। ফিরদৌসি তার হাত ধরে উঠে বসল তখন। বলল, 'কেন ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করে?'

'কী?'

'আমি-যে কিছু বলতে পারি না। আমি যেতে চাই না, চম্পা।' বলতে বলতে সে হাত রাখল চম্পার চুলে, সেখান থেকে বেরুল গোলাপ। স্বপ্নের মতো হাসল চম্পা, একহাতে সেটাকে সে ধরে রইল দু জনের মাঝখানে। চম্পা বলল, 'চলো, আমরা চলে যাই। যাবে?'

'কোথায়?'

তার জবাব দিল না চম্পা। চোখে চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল দু জন। নাগরদোলার মতো তাদের চোখ থেকে চোখে উঠতে-পড়তে লাগল আনন্দ, বিষাদ, বাস্তব ও বিভ্রম।

ফিরদৌসি তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে চুলের মধ্যে ঠোঁট রেখে বলতে লাগল, 'প্রথম যেদিন এলাম, তোমার কপালে এসে পড়েছিল চাঁদের মতো কয়েকটা চুল। তোমার মনে নেই চম্পা? আমার তখন মনে হল, আমি পারি। তোমার চুলের ভেতর থেকে আমি প্রথম গোলাপটা পেয়েছিলাম। না?'

রাস্তার ওপর থেকে কুকুরটা তখন চলে গেল বনের দিকে, পাতার মধ্যে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে রইল রাত্রির বাতাস, যেন সেও উৎকর্ণ হয়েছে শুনবে বলে।

'আমার মনের মধ্যে কে যেন বলে, ওই তো গোলাপ। ঠিক যেমন তোমাকে দেখছি চম্পা, আমি স্পষ্ট দেখতে পাই গোলাপ। রঙ, গন্ধ, সব। আমি হাত দিই, হাতের দিকে তাকিয়ে

দেখি গোলাপ। তখন আমি চারিদিকে দেখতে পাই গোলাপ। আমার মন থেকে বলে, হাত ছুঁলেই ওরা আমার হাতে এসে পড়বে। এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে?'

চম্পা তার বুকের পরে মুখ রেখেই বলল, 'না।'

'তোমার বিশ্বাস হয় না?'

'হয়।'

'তোমার বাবা জিজ্ঞেস করলেন, আমি বলতেই পারলাম না চম্পা।'

চম্পা মুখ তুলে বলল, 'চলো আমরা যাই।'

কান্নার মতো করে উঠল ফিরদৌসির মুখ। শুধাল, 'কেন চম্পা?'

'আমার খুব দুঃখ। আমি খুব একা। আমি তো আর কিছু না, আমাকে ওরা আর্টিস্ট ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। বাবাও না। বাবার জন্যে জহিরকে আমি কিছু বলতে পারি না। আমাকে মুক্তি দাও। আমাকে নিয়ে চলো তুমি।'

তখন ফিরদৌসি হাসল, 'ছি, দুঃখ থেকে পালায় না চম্পা। দুঃখ থেকে আনতে হয় আনন্দ। দুঃখ থেকে যে পালায়, আনন্দও তাকে ফাঁকি দিয়ে বেড়ায়।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে চম্পা। আনমনে বাতিটা নিয়ে বড় করে, আবার ছোট করে। ব্যাকুল দু চোখ মেলে ফিরদৌসি বলে, 'আমার গোলাপ চম্পা— আমি তো জানি, নেই। তবু ভেতর থেকে যখন খুব বিশ্বাস হয়— আছে, তখন হাত দিলেই পাই। পালাবে কেন? দুঃখের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো— ওই তো, কই দুঃখ! ওই তো, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দ্যাখো চম্পা, ওই তো তোমার সব আনন্দ ফুলের মতো হাসছে। ছিঃ, পালাবে কেন?'

চম্পাকে আবার বুকের মধ্যে টেনে নিল ফিরদৌসি। তখন চম্পার মনে হল, তার আর কোনও দুঃখ নেই। তার যাযাবর জীবনের একাকীত্ব নেই, বাবার পেশায় নিজের আত্মদানেও বেদনা বা জ্বালা নেই, জহিরের লোভাতুর হৃদয়টাও যেন তাকে আর স্পর্শ করতে পারছে না। বেঁচে থাকার প্রবল তাগিদে যে পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে চম্পা, বেঁচে থাকার জন্যে যত মৃত্যুকে তার স্বীকার করে নিতে হয়েছে, সব এই মুহূর্তে ঝলমল করে উঠল এক অখণ্ড গৌরবে, অহঙ্কারে।

ফিরদৌসি বলল, 'কেউ বিশ্বাস করবে না চম্পা।'

চম্পা বলল, 'হ্যাঁ, কেউ বিশ্বাস করবে না।'

সেই রাস্তায় ফিরদৌসি দেখতে পেল চম্পা তার পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। সে তার হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। এবার আর কোথাও থামল না, একেবারে শেষপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা দু জন। বাতাস আবার সরসর করতে লাগল জামরুলের পাতায়। বাদুড়-তাড়ুয়া টিন আবার সারারাত ঢনঢন করতে লাগল। বনের মধ্যে পাতায় ছাওয়া নিবিড় একটা বিছানায় ঘুমিয়ে থাকল সেই কুকুরটা।

জহির বলল, 'আমি নিজে দেখেছি ওস্তাদ। পটকা, বোঁচানাক ওরাও দেখেছে। বাঞ্চোতের সাধুপনা আজ আমি গলায় পা দিয়ে বার করব। কুত্তা কাহি কা।'

প্রথমে দেখেছিল বোঁচানাক। ভোরবেলায় উঠে টিউবওয়েলের দিকে যাচ্ছিল, দেখে দরজা হাট করা। ভেতরে ফিরদৌসির বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে চম্পা।

প্রফেসরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল জহির। চিৎকার করে বেলা মাথায় তুলে ফেলল। 'আমি আর একদণ্ড নেই দলের সঙ্গে। এসব আমি দেখতে পারব না। গোলাপের গুণ এত করে জিগ্যেস করল তবু বলল না। কতবড় ওস্তাদ? এখন আবার ছি ছি কেলেঙ্কারি। এই আমি চললাম। দেখি, কে আমাকে রাখে। ওস্তাদ তো বুড়ো হয়ে চোখের মাথা খেয়েছে। আমি না থাকলে কবে ছত্রখান হয়ে যেত।' তাকে আর কিছুতেই থামানো গেল না।

প্রফেসর প্রথমে বিহ্বল, পরে ভীত, শেষে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। গতরাত্রে ফিরদৌসির ব্যবহারে এমনিতেই মর্মাহত হয়েছিলেন। আজ এ-কথা শুনে যেন আগুন জ্বলে উঠল শরীরে। তার ওপরে বারান্দা থেকে জহিরের ক্রমাগত দল ছেড়ে যাওয়ার হুমকি শুনে পায়ের নিচে যেন একফোঁটা মাটি পেলেন না তিনি।

ওদিকে এত চিৎকারের উৎপত্তি, দুজন জেগে গেছে। তারা দুজন দুজনের দিকে তাকাল, সে দৃষ্টিতে বিনিময় হল আমরণ বিশ্বাসের এক ক্ষণবিদ্যুৎ।

চম্পা বেরিয়ে এসে বারান্দা ঘুরে ঘরের মধ্যে প্রফেসর আর বাইরে জহির ও ব্যান্ডপার্টির চারমূর্তির সুমুখ দিয়ে মাথা উঁচু করে স্মিত মুখে চলে গেল যে-ঘরে উনুন করা হয়েছিল। সেখানে সে ছাই তুলে দাঁত মাজতে লাগল টুলের ওপর নির্বিকার বসে বসে পা দুলিয়ে। পটকা এল, তার পায়ে পা দিয়ে খোঁচা দিয়ে বলল, 'কচ্ছপের মতো আর হাঁটতে হবে না। চা কর শিগগির, খিদেয় মাথা ঘুরছে।' পটকা যেন সে-কথা শুনেইনি, চোয়াল ঝুলিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তখন চম্পা তার কান ধরে উনুনের কাছে দাঁড় করিয়ে দিল। হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, 'কান তো নয়, দুটো আমের আঁটি। কী শক্ত রে বাবা।'

ফিরদৌসি এসে দেখল পায়রার খোপে পায়রাগুলো ডানা ঝটপট করছে আর তারের জালে ঠোঁট ঘষছে, যেন কেটে ফেলবে। সে চোখ গোল করে বলল, 'দাঁড়া দাঁড়া।' তার পর একটা একটা করে তাদের বার করতে লাগল সে, আর আঙুল দিয়ে পালকে চিরুনি করতে করতে আদর করল, নকল স্বরে বাকবাকুম ডাকল, গালেগলায় চেপে ধরতে লাগল চোখ বন্ধ করে, ঘষতে লাগল।

সে-রাতে চম্পাকে জোর করে অঙ্কশায়িনী করবার পর থেকে মনের মধ্যে একটা গ্লানি ছিল জহিরের যেটা কিছুতেই যাচ্ছিল না। চেঁচামেচি করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করল গ্লানিটা যেন আর নেই। তখন আরও চিৎকার করতে লাগল সে, জেদি একটা খোকার মতো এক কথাকেই বার বার বলতে লাগল, শেষে তেড়ে গেল ফিরদৌসিকে একচোট শিক্ষা দেবে বলে। আজ একটা সুযোগ, আজকের আগুনেই তাকে জঞ্জাল পুড়িয়ে পথ পরিষ্কার করতে হবে, সেটা সে বুঝতে পেরেছিল। রোষটা নিভে যেতে দিলে চলবে না।

'ওরে বদমাশ, পায়রা আদর করা হচ্ছে।' ফিরদৌসিকে দেখতে পেয়েই তিড়বিড় করে উঠল জহির। তার পিছনে এসেছেন প্রফেসর, নিঃশব্দে। জহির বলল, 'কথার জবাব নেই কেন?'

ফিরদৌসি বড় বড় চোখ মেলে তাকাল! বলল, 'আমাকে কিছু বলছিলে?' বলেই সে আবার পায়রার দিকে মনোযোগ দিল।

চিৎকার করে উঠল জহির, 'তোমার আস্পর্ধা আমি দেখছি। আমার বউয়ের ওপর মেসমেরিজম? তার জাত নষ্ট করা?'

'তোমার বউ?' অবাক হল ফিরদৌসি।

হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল জহির। তার পরই তার স্বমূর্তিতে ফিরে গেল। 'ওই একই কথা, বউ না হোক, চম্পার সাথে আমার বিয়ে হবে।'

'আমি তো চম্পাকে বললাম, পালাতে নেই। তোমাকে বলেনি?'

এবার জহিরের অবাক হবার পালা। প্রফেসরও বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'কে পালাতে চায়?'

তেমনি শান্তকণ্ঠে পায়রা আদর করতে করতে ফিরদৌসি জবাব দিল, 'কেন চম্পা। বোকা মেয়ে। ওকে বললাম'—

জহির প্রফেসরকে বলল, 'ওস্তাদ, চম্পাকে নিয়ে পালাবার মতলব আঁটছে। এখন ধরা পড়ে মেনি বেড়ালের মতো মেউ মেউ করছে। বটে, পালাতে হলে জানটা রেখে পালাবি হারামজাদা।'

বলেই এক ঝটকায় ফিরদৌসিকে টেনে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল জহির। এই আকস্মিকতায় হঠাৎ ফিরদৌসির হাত থেকে পায়রাটা ছাড়া পেয়ে গেল, বিষম ভয় পেয়ে সেটা এক প্রবল শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল জহিরের মুখে— মুখটাকে একটা কার্নিশ কি গাছের ডাল মনে করে সেখানে বসবার জন্যে দু পায়ের তীক্ষ্ণ নখর মেলে আঁচড়াতে লাগল। মুহূর্তে সুতোর মতো অসংখ্য রক্তাক্ত রেখা ফুটে উঠল জহিরের মুখে। বিকট আর্তনাদ করে উঠল সে। দু হাতে মুখ ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। বোকার মতো দাঁড়িয়ে প্রফেসর 'আরে, এ কী' করতে লাগলেন। তখন ফিরদৌসি খপ করে পায়রাটাকে ধরে হাতের এক লম্বা দুলুনি দিয়ে উড়িয়ে দিল জানালা দিয়ে।

তার চিৎকারে ছুটে এল সবাই। ব্যান্ডপার্টির চারমূর্তি রক্ত দেখে 'খুন, খুন' বলে লাফাতে লাগল। সামাদ এসে চেপে ধরল জহিরের হাত। জহির হাঁপাচ্ছিল, তখনও মুখ ঢাকছিল, যদিও পায়রাটা ছিল না। প্রফেসর তাকে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'চুপ, চুপ।' তার সবচে বড় ভয়, বাইরের কেউ শুনতে পেলে দলের সুনাম নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। সবার শেষে এসে দাঁড়াল চম্পা!

চম্পা যেন তার বাবাকে আজ আর চিনতে পারল না। রুষ্ট স্বরে, সম্রাটের মতো তার কণ্ঠে আদেশ। 'এই, ওকে ঘরে নিয়ে ওষুধ দাওগে। চম্পা, তুমি যাও, আমার হাতবাক্সে ওষুধ আছে। সামাদ, বাইরে দাঁড়িয়ে দ্যাখো, বাজে লোক ভিড় করতে দিও না।'

আস্তে আস্তে শূন্য হয়ে গেল ঘর। কেবল প্রফেসর আর ফিরদৌসি! মুখোমুখি।

একটা দীর্ঘ মুহূর্ত অতিবাহিত হয়ে গেল। যেন এ নিস্তব্ধতা আর কোনোদিন ভাঙবে না। হঠাৎ ফেটে পড়লেন প্রফেসর নাজিম পাশা। 'বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে।'

চঞ্চল হয়ে উঠল ফিরদৌসি।

'আমি ঢের সহ্য করেছি। কাল রাত্তিরে আমার কথার জবাব না দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেলে! এখন বুঝতে পারছি, সাহসটা কোথায়। কারো তো বাপু মেসমেরিজম। তাই বলে আমার মেয়ের ওপরেও? তবে জেনে রাখো, মেসমেরিজম আমিও জানি। আমিও পারি তোমাকে এক পায়ের ওপর সারাজীবন দাঁড় করিয়ে রাখতে, বোবা বানিয়ে রাখতে পারি, কুঁজো বানিয়ে রাখতে, রাস্তার কুকুর করে রাখতে পারি। আমার মেয়েকে নিয়ে পালানোর মতলব? আমার খেয়ে আমারই শত্রুতা? ইতর, বদমাশ, বেরিয়ে যাও।'

একটা কথার জবাব দিল না, প্রতিবাদ করল না ফিরদৌসি। প্রফেসরকে সে ভক্তি করত, প্রথম দিন থেকেই সবাই দূরের আর অবহেলার মনে করেছে, একমাত্র প্রফেসর মনে করেননি— তখনই যেন সে কেনা হয়ে গিয়েছিল তাঁর। সে-কথা আজও ভোলেনি ফিরদৌসি। চোখ ফেটে পানি আসতে চাইল তার। মনে হল, তার বাবা মরে গেলেন এইমাত্র। সবচে বড় হয়ে বাজল মেসমেরিজমের অভিযোগ। জহির বলেছে, কিছু মনে হয়নি। প্রফেসর বললেন, আত্মধিক্কারে ভরে উঠল তার মন। মাথা নিচু করে সে বেরিয়ে গেল।

ফিরে এসে প্রফেসর যখন দেখল চম্পা ওষুধ বার করে দেয়নি, আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে, অন্ধের মতো চড় বসিয়ে দিলেন চম্পার গালে। চম্পা সে আঘাত সইতে না পেরে একটা হাতল-ভাঙা চেয়ারের ওপর গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। এতটা হবে ভাবেননি তিনি। কিন্তু হঠাৎ বিচলিত হতেও বাধল তার। তাই আরও গলা চড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'তুমি ভেবেছ কী? আমার চোখের ওপর, এত সাহস তোমার? তোকে আমি সাত টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেব, তোর জন্যে আমি গলায় দড়ি দেব, আজই বিয়ে দেব তোর। এতবড় সাহস, আমি মরে গেছি মনে করেছিস?'

পিটপিট করে চোখ খুলল জহির। ফিটকিরি দিয়ে মুখ ঘষে দিয়েছিল চালকুমড়ো, কনকন করছে, ঝাপসা হয়ে আসছে চোখ, তবু তাকাল জহির। একটু জোরে ককিয়ে উঠে জানান দিতে চাইল নিজেকে।

বোধহয় তাতে কাজ হল। প্রফেসর নতুন করে বলে উঠলেন, 'পালাবার মতলব দিচ্ছে সে তোরই কপাল ভাঙবার জন্যে।'

বাইরে জহির আবার ককিয়ে উঠল, 'চাই না, চাই না আমি কিছু। আমি একমুহূর্ত আর থাকব না। সব খেলা আমি ফাঁস করে দেব। দেখি কে আমাকে ঠেকায়। দেখি কোন্ শালা শো দ্যাখে। আমি মানুষ না, না? চম্পা আমাকে অপমান করল সেদিন, কিছু বললাম না। আর সহ্য করব না আমি। আমি বেরিয়ে যাব ! সব ফাঁস করে দেব। আমি কারও খাই, না পরি?'

মহা ফাঁপরে পড়লেন প্রফেসর। জহির দল ছেড়ে চলে গেলে যে একেবারে পথে বসতে হবে তাকে। আর তার ওপর যদি একেকটা খেলা সবার কাছে ফাঁস করতে থাকে তো— আর ভাবতে পারলেন না তিনি। চম্পাকে ধমকে উঠলেন, 'জহিরকে হাতে করে শেখালাম পড়ালাম সে কার জন্যে রে? আমার কী? দেখি, আমি মরে গেলে কী খায়? দেখি, তোর বাড় কদ্দুর।'

তার পর ধপ্ করে চৌকির উপর বসে পড়লেন তিনি। চম্পা ভাবল, বোধহয় নিঃশব্দে আবার কাঁদছেন বাবা। চোখের কোণ দিয়ে দেখল— না, অপলক তাকিয়ে আছেন তার দিকে। চোখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিল, প্রফেসর বললেন, 'তোর বিয়ে দেব জহিরের সাথে। কোনও কথা শুনতে চাই না আমি।'

খাড়ানাক সে সময়ে এসে ভয়ে ভয়ে বলল, 'ওষুধটা'—

'ও হ্যাঁ, ওষুধটা।' বলে প্রফেসর তাঁর হাতবাক্স থেকে মলমের কৌটাটা বার করে দিলেন।

ফিরদৌসি যেতে পারল না কোথাও, যদিও ইচ্ছে করল তার। কাঁদতে পারল না, যদিও কাঁদতে ইচ্ছে করল। স্কুলের পেছনে, পাঁচিলের ওধারে এককালে দালান ছিল, এখন শুধু ভাঙা ভিতটা আছে— সেখানে গিয়ে সে বসল। সারাদিন বসে রইল সেখানে। প্রফেসর তাকে মেসমেরিজমের

কথা বলে যে-কষ্ট দিয়েছেন, তার কোনও পরিমাপ নেই। তবু আঙুল দিয়ে ধুলোর ওপর দীর্ঘ দাগ দিল, ছোট করল, একেবারে মুছে ফেলল, আবার নতুন করে আঁকল। আবার, আবারও। সারাদিন। ব্যান্ডপার্টির চারমূর্তি কুলি ছেলেদের ঘাড়ে পোস্টার তুলে হ্যান্ডবিলের তাড়া নিয়ে বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে গেল নিত্যকার মতো শহর পরিক্রমায়। সে বাজনা কানেও গেল না ফিরদৌসির। কেউ তাকে খুঁজতে এল না। সারাদিনের ক্ষুধাতৃষ্ণা; কেউ তার কাছে এল না। শুধু কেঁপে উঠল ঠোঁট। নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলতে লাগল ফিরদৌসি। 'আমি কী অপরাধ করেছি? আমার— আমি— চম্পা, কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি কী অপরাধ করেছি?'

একটা বেড়াল অনেকক্ষণ ধরে ঘুরঘুর করছিল তার সামনে, সবুজ চোখে তাকাচ্ছিল আর চোখ বুজছিল। সাহস করে যখন একেবারে কাছে এসে গলা তুলে ডাকল মিহি করে তখন তাকে কোলে তুলে নিল সে। পেটে পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'কি রে হতভাগা? এত নাচ দেখাচ্ছিলি কেন? পিঠ উঁচু করে পায়ে পায়ে ঘোরাই তোর সারা হল। আমার কাছে কিছু নেই রে, কিছু দিতে পারব না।' তখন বিড়ালটা গরগর করে উঠল। ফিরদৌসি বলল, 'বললাম, আমার কিছু নেই। আচ্ছা এটা নিবি?' বেড়ালটা তার হাতে অতবড় লাল গোলাপটা দেখে ভড়কে গেল, চোখ বুজল এক মুহূর্তের জন্যে, তার পর লাফ দিয়ে তীরের মতো পালিয়ে গেল। আর এল না। হা হা করে হেসে উঠল ফিরদৌসি। হাসতে হাসতে দম বন্ধ হতে বসল, শরীরটা সামনে ঝুঁকে পড়ল, তবু সে হাসি থামল না। তার দমকে চোখ ভরে গেল পানিতে, ঝরঝর করে পড়তে লাগল গাল বেয়ে। তারপর হাসিটা বন্ধ হয়ে গেল, শুধু পড়তে লাগল পানি।

আবার অভিমানটা সচল হয়ে উঠল বুকের ভিতরে। গুমরে মরতে লাগল প্রফেসরের তিরস্কারগুলো। অবোধের মতো কয়েকবার মাথা নাড়ল ফিরদৌসি। হাতের গোলাপটা দেখল। আনমনে একটা পাপড়ি ছিঁড়ল তার। তার পর আরেকটা, এমনি করে সব কটা। ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিল বাতাসে। তারা পায়ের কাছে নিঃশব্দে এসে পড়তে লাগল। যখন শেষ হয়ে গেল, আরেকটা গোলাপ বার করল সে ভিতের ফাটল থেকে। তারও সব পাপড়ি বসে বসে ছিঁড়ল সে। আরেকটা বার করল। তখন যেন নেশায় পেয়ে বসল তাকে। একে একে সাতশো ছিয়াশিটা গোলাপ কখন সে বার করল এখানে-ওখানে স্পর্শ করে আর তাদের পাপড়ি ছিঁড়ল। পায়ের কাছে পাহাড় হয়ে উঠল রক্তগোলাপের ছেঁড়া পাপড়িতে। আবার যখন হাত রাখল তখন আর গোলাপ পেল না। তখন মনে পড়ল, সাতশো ছিয়াশিটা হয়ে গেছে, আজ আর আসবে না। তখন মনে পড়ল কেউ বিশ্বাস না করুক, কেউ তাকে ভালো না বাসুক, একজন তাকে বিশ্বাস করে, একজন তাকে অবহেলা করেনি। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল চম্পার কপালে দুলতে থাকা চাঁদের মতো একগুচ্ছ চুল। তখন সে উঠে দাঁড়াল। চারদিকে সূর্যশেষের অন্ধকার। হাঁটতে লাগল ফিরদৌসি। সে ফিরে আসতে লাগল স্কুলের দিকে।

কাউকে জিজ্ঞেস না করে বেকুবের মতো টিকেটঘরের জানালা খুলে বসেছে পটকা আর চালকুমড়ো। চেহারা ভব্য করে টিকেট বেচতে শুরু করেছে। বিক্রিও হচ্ছে রমারম। দিয়ে কুলান নেই। অথচ ওদিকে সাজঘর অন্ধকার। দরজা দিয়ে লোক ঢুকছে। এখানকার যারা বায়না দিয়ে এনেছিল তাদের লোক গেটে গেটে দাঁড়িয়ে টর্চ জেলে পথ দেখাচ্ছে। কেউ বলছে, 'দেখবেন মা-বোনেরা, ওখানে একটা গর্ত আছে।— এই ভাগো, ভাগো হিয়াসে।'

দরজায় খিল দিয়েছে চম্পা। আর খুলছে না। জহির আর সামাদ ডেকে ডেকে সারা হল, সাড়া পেল না। গলা তুলতে পারল না, দরজা ভাঙতে পারল না, পাছে লোক জানাজানি হয়ে যায়।

আর প্রফেসর সেই দুপুরে শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন, কাউকে যেন চোখেও দেখছেন না, কথা বলার শক্তিটুকুও যে হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। চম্পা তার মুখের ওপর বলেছে, 'না, এ বিয়ে আমি চাই না।'

'চম্পা!'

'না, না, না।'

সেই মুহূর্তে যেন প্রফেসর পাথর হয়ে গেলেন। চম্পাকে নতুন করে দেখলেন। মিস চম্পা— প্রাচ্যের সেরা রূপসী— যার অঙুলি হেলনে আকাশের বিদ্যুৎ স্তম্ভিত হয়— সে নয়; তাঁর মেয়ে চম্পা। তখন বড় ক্লান্ত মনে হল নিজেকে। এক পাঁক গ্লানিতে ডুবে গেলেন তিনি। অপরাধীর মতো মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলেন। চম্পা চলে গেল পাশের ঘরে, দৃপ্ত পা ফেলে। গালে তার পাঁচটা আঙুলের ছাপ নীল হয়ে ফুটে রয়েছে তখনও।

ফিরদৌসি! বিদ্যুতের মতো তার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল প্রফেসর নাজিম পাশার— প্রফেসর জে.সি. দত্ত-র সাকরেদ মোহাম্মদ নাজিমুদ্দিন ভুঁইঞা, যিনি বারো বছর আগে নিজে এই দল করেছিলেন, তাঁর। চমকে উঠলেন তিনি। যেন সরে গেল স্টেজের ওপর থেকে এক কালো পর্দা। দেখতে পেলেন নিজেকে, জহিরকে, চম্পাকে। ফিরদৌসি আসবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যা ছিল গোপন, সে এল আর তা বেরিয়ে পড়ল— এক অপরিসীম ক্ষুধা, গ্লানি আর করুণার চিত্র, অন্ধকারে নৃত্যপর কঙ্কাল আর উড়ন্ত রৌপ্যমুদ্রা। সে এক নির্মম আগন্তুক, ফিরদৌসি। হাতে তার রক্তগোলাপ। বালিশে মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন প্রফেসর। যোগ্য মনে হল না নিজেকে যে চম্পাকে ডাকবেন, সাহস হল না জহিরকে সামনা করবেন, ভয় হল খুঁজতে গিয়ে ফিরদৌসিকে যদি আর না পাওয়া যায়।

প্রফেসরকে ডাকতে যাচ্ছিল জহির, এমন সময় যারা বায়না করে এনেছিল, তাদের একজন এসে পাকড়াও করল তাকে। 'কি, আপনাদের দেরি কিসের? সাতটা কখন বাজে। পাবলিক আর বসে থাকতে চাইছে না।' জহির কোনোরকমে উত্তর দিল, 'এই এক মিনিট। মাত্র এক মিনিট।' লোকটা চলে গেলে দৌড়ে সে প্রফেসরকে ধাক্কা দিয়ে জাগাল। 'ওস্তাদ' শো-র টাইম হয়ে গেছে। চম্পা দরজা খুলছে না। টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। ওস্তাদ।' দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল জহির। প্রফেসর অস্পষ্টভাবে একটা হাত নাড়লেন। জহির আবার তাকে ধাক্কা দিল, ডাকল, 'ওস্তাদ! পাবলিক বসে আছে। আধঘণ্টা হয়ে গেছে।' প্রফেসরের হাতখানা অসাড় হয়ে পড়ে গেল বিছানায়।

ব্যান্ডপার্টির চারমূর্তি শো-র শুরুতে বাজাবার জন্যে একটা গৎ জানত মিনিট পনেরোর। সেটা দু-বার বাজাল। তবু যখন পর্দা উঠল না তখন ঘাম ছুটল সারাশরীরে। পর্দার এপাশে দর্শকদের দিকে আড় হয়ে এককোণে তারা বসে ছিল। তাদের ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে দেখে তারা ঘন ঘন তাকাতে লাগল পর্দার দিকে আর ঢোক গিলল। গৎটা যখন দু-বার বাজানো হয়ে গেল, থামল, তখন একমুহূর্তের জন্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, সবাই ভাবল বাজনার এই বিরতি বোধহয় পর্দা ওঠার ইঙ্গিত। কিন্তু তা যখন হল না, তখন দ্বিগুণ অস্থির হয়ে উঠল লোক।

ছোকরারা শিস দিতে লাগল, মেয়েদের মধ্যে বাচ্চারা কেঁদে উঠল তারস্বরে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ব্যান্ডপার্টির চারমূর্তি কঙ্কাল-নৃত্যের সঙ্গে বাজাবার গৎটা শুরু করে দিল চড়া পর্দায়।

হঠাৎ পর্দা উঠল। লোকেরা অন্ধকারের মধ্যে প্রথমে কিছু ঠাহর করতে পারল না। ব্যান্ডপার্টির চারমূর্তি অবাক হয়ে গেল শো-র শুরুতে প্রফেসরের বদলে জহিরকে দেখে। তার মুখে পায়রার আঁচড়ের দাগগুলো পাউডারেও ঢাকেনি। এক অজানা ভয়ে ভেতরটা হিম হয়ে গেল চারমূর্তির, কিছু বুঝতে না পেরে আচমকা বাজনা থামিয়ে দিল তারা।

জহির এগিয়ে এল না। স্টেজের প্রায় পিছনে পর্দা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে কী বলল শুনতে পেল না কেউ এক বর্ণ। চেঁচিয়ে উঠল সবাই, 'লাউডার প্লিজ, লাউডার প্লিজ।' একটা তীক্ষ্ণ শিসও শোনা গেল।

দু পা এগিয়ে এলো জহির। 'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, আপনাদের প্রিয় আর্টিস্ট মিস চম্পা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আজ শো দেখানো সম্ভব হবে না। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ— '

দড়াম করে একপাটি জুতো এসে পড়ল স্টেজের ওপর। যেন কিছুই হয়নি, জহির আবার শুরু করল, গলা চড়িয়ে, 'ভদ্রমহিলা'— এবারে সাইকেলের আধখানা টায়ার আর ইটের আস্ত আধখানা এসে পড়ল স্টেজে। এ এক অদ্ভুত জনতা ! এরা কথা বলে না। এরা হাতের কাছে যা পায় ছোড়ে, শিস দেয়, বাচ্চারা কাঁদে। এরি মধ্যে মেয়েদের অভিভাবকেরা মেয়ে সামলাবার জন্য চারদিকে ওঠবোস করতে শুরু করেছেন, কেউ কেউ বেরিয়ে আসছেন।

গোলাপের গন্ধ পেল চম্পা। চঞ্চল হয়ে অন্ধকার ঘরে সে উঠে বসল। কোথায় সে ? ঠিক সেই সুগন্ধ। সারা ঘর ম ম করছে। উঠে দাঁড়াল চম্পা। সারাদিনের অনাহারে পাক দিয়ে উঠল পেটের ভেতরে। মাথাটা বালিশে রেখে বসে পড়তে হল। তখন আর কোনও বোধশক্তিও রইল না। শুধু মনে হল মাথার মধ্যে রামধনুর মতো একটা রঙিন জাঁতা ঘুরছে।

স্টেজে দাঁড়িয়ে জহির আরেকবার চিৎকার করে বোঝাতে যাবে, এমন সময় দেখল, পাশে ফিরদৌসি এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে তার শো-এর পোশাক, চুল আঁচড়ানো, জ্বলজ্বল করছে মুখ। আচমকা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল জহিরের। খপ্ করে ফিরদৌসির হাত ধরে সে দ্রুত স্খলিত কণ্ঠে বলল, 'গোলাপের খেলাটা শুরু করো। এরা মানছে না।'

হলের ভেতরে আরও কয়েকখান ইট এসে গিয়েছিল, যারা এনেছিল নিঃশব্দে পায়ের কাছে লুকিয়ে ফেলল। কয়েকজন আঙুল তুলে বলাবলি করতে লাগল ফিসফিস করে। 'ওই যে, ওই লোকটা— ওই যে পরে এল, বাম দিকে।' একটা বাচ্চা তখনও কাঁদছিল, সেও থেমে গেল, মা-র দুধ আবার মিঠে মনে হল তার।

তাকে কোনও কথা বলতে না দেখে জহির চাপাগলায় হিসহিস করে উঠল, 'ফিরদৌসি ! যাও, সামনে যাও ! হাঁ করে থেকো না।' বলতে বলতে সে ঠেলে দিল তাকে সামনে।

লোকরা তখন নড়েচড়ে বসল। কেউ কেউ হাততালি দিয়ে উঠল। বলল, 'আমাদের গোলাপ দেবে।'

একমুহূর্তে ফিরদৌসির মনে পড়ল সব। কুড়িগ্রামে সেই বৃষ্টির সন্ধে, চম্পার সঙ্গে রাত, প্রফেসরের তিরস্কার। বাস্তব আর স্বপ্নের মধ্যে সে দেখতে পেল নিজেকে। তাকে বেছে নিতে

হবে। এখন। এই মুহূর্তে। হলের অন্ধকার ছাদে সে দেখতে পেল রক্তগোলাপের চিত্র। সারাশরীর থরথর করে কেঁপে উঠল তাঁর। কেউ বিশ্বাস করবে না, চম্পা। চম্পা, পালাতে নেই, ছিঃ।

আজকের সাতশো ছিয়াশিটা গোলাপ সে নিঃশেষ করে ফেলেছে তবু সে আবার একাগ্র করে আনল তার সমস্ত বিক্ষিপ্ত মন। বিড়বিড় করে বলল, 'আছে, আছে, আসবে, আমি আনতে পারব, আজ আরেকবার আমাকে দাও।' দর্শকদের দিকে তাকাল সে পূর্ণ দু চোখ মেলে। অপলক তাকিয়ে আছে তারা। প্রত্যাশায় তাদের চোখ কোমল হয়ে উঠেছে। নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন শোনা যাচ্ছে হৃৎস্পন্দন। 'আমি সবাইকে দেব। কেউ শূন্য হাতে ফিরে যাবে না। কেউ বিশ্বাস না করুক, আমার কী তাতে আসে যাবে? ওদের হাতে প্রত্যেকের বাড়ি নিয়ে যাওয়া গোলাপের সাথে আমি প্রত্যেকের বাড়ি যাই।' দর্শকের ওপর থেকে তার চোখ ফিরিয়ে আনল সে। জহিরকে বলল, 'শো বন্ধ থাকবে না। রোজ যেমন শুরু হয়, তেমনি হবে।'

শান্ত স্তব্ধ প্রতীক্ষায় অধীর দর্শকের সামনে আবার এগিয়ে এল ফিরদৌসি। মেঘের মতো সুদূর গম্ভীর কণ্ঠে সে ঘোষণা করল, 'আমার ভাইবোনেরা, আপনারা হতাশ হবেন না। বহুদূর থেকে এসেছেন আপনারা আশা নিয়ে— শো হবে।' করতালিতে ধ্বনিত হয়ে উঠল হল।

অন্ধকার ঘরে স্বপ্নের মধ্যে প্রফেসর যেন শুনতে পাচ্ছেন দর্শকের করতালি আর প্রতীক্ষা, আবার করতালি, ব্যান্ডের আওয়াজ। অবাক হয়ে গেলেন তিনি। শো হচ্ছে। ওই তো ওরা আনন্দে আবার করতালি দিয়ে উঠল। ওই, ওই তো। উঠে দাঁড়িয়ে চম্পার কামরায় এলেন। অবাক হলেন দরজা বন্ধ দেখে। তাহলে চম্পা স্টেজে যায়নি! কিন্তু এইমাত্র তিনি-যে শুনতে পেলেন সেই বাজনা, যে বাজনা বাজে চম্পা যখন বোর্ডে গিয়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ায় আর তিরিশটা ছোরা হাতে জহির একের পর এক ছুড়তে থাকে। ওই তো সে বাজনা শুরু হল।

'চম্পা, চম্পা।' পাগলের মতো প্রফেসর স্টেজের দিকে ছুটলেন। কিন্তু প্রত্যেকটা দরজায় এত ভিড় যে তিনি ঢুকতে পারলেন না। সবাই বিরক্ত হয়ে তাকে কনুই দিয়ে ঠেকিয়ে রাখল। কেউ ফিরেও তাকাল না তার দিকে। কেউ চিনতে পারল না। তখন পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করলেন, সে দরজাও বন্ধ। দমাদম আঘাত করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু শোনা গেল না। প্রবল বাজনার অতলে তলিয়ে গেল প্রফেসর নাজিম পাশার করাঘাত। আজ তিনি বাইরে। তাকে বাইরে থাকতে হচ্ছে। আজ আর ঢুকতে পারবেন না। কোনও দরজা খোলা নেই তাঁর জন্য।

বোর্ডে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ফিরদৌসি। হাসল। হাসল না তো যেন একখণ্ড স্মিত বিদ্যুৎ স্থির হয়ে রইল ঠোঁটে। আধখানা বৃত্ত আঁকল ডান হাত দিয়ে জহির তার পেছনে, তার পর বৃত্তটাকে চোখের পলকে প্রসারিত করে দিল সুমুখে, সরলরেখায়।

থরথর করে সারা হলে ফেটে পড়ল গোলাপের সুগন্ধ। এক পশলা গোলাপে ভরে গেল সামনের সারি। করতালি আর উল্লাসে বধির হয়ে গেল শ্রবণ। প্রথমে বিহ্বল পরে নিজের কৃতিত্বেই মুগ্ধ হয়ে গেল জহির। দ্রুত সে দ্বিতীয়টি হাতে নিল। নেশার মতো এক সব-বোধ অন্ধ-করা অনুভূতিতে মাতাল হয়ে উঠল তার হাত।

দরজার খিল খুলে ফেলল চম্পা। এতক্ষণ তার ঘরে যে-সুগন্ধ ছিল গোলাপের, হঠাৎ এক বাতাসের দমকে যেন তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কী হল? এত করতালি কেন?

সারা হলে তখন পশলার পর পশলা গোলাপের বৃষ্টি হচ্ছে। ফোয়ারা থেকে শীকরের মতো উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে গোলাপ। গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে সুগন্ধ। ভারি হয়ে আসছে বাতাস। এক আশ্চর্য জাদুর সন্ধান পেয়ে লোকের কণ্ঠে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হচ্ছে অভিনন্দন।

সাতাশ— আটাশ— উনত্রিশ— তিরিশ। শেষ ছোরাটা জহিরের হাত থেকে যখন উড়ে গেল তখন গোলাপ ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না সারা হলে। যেন গোলাপের ঝড় উঠেছে। রাশি রাশি গোলাপ উড়ছে, ছিটকে পড়ছে, ডুবিয়ে দিচ্ছে— গোলাপ আর গোলাপ। এমনকি সারা স্টেজেও আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, শুধু অগণিত গোলাপের রঙ আর সুগন্ধ।

সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের মতো করতালির মধ্যে নেমে এল পর্দা। দৃশ্য আড়ালে চলে গেল, আর দেখা গেল না, তবু সে করতালি থামল না। থামল না সপ্তমে ওঠা ব্যান্ডপার্টির সুর। থামল না প্রফেসরের অবিশ্রান্ত করাঘাত। চম্পা জানতে পারল না, সাতশো ছিয়াশিটি গোলাপ ফুরিয়ে গেলেও ফিরদৌসি আজ আবার গোলাপ আনতে পেরেছে।

পর্দার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড থেকে ফিরদৌসি আস্তে আস্তে বসে পড়ল তার পায়ের ওপর, যেন সিজদা দিতে যাচ্ছে। হঠাৎ দ্রুততা এল তার ভঙ্গিতে, যেন একমুহূর্ত সময় আর নেই। গোড়ালির ওপর বসবার আগেই মাথা নত হয়ে এল তার ! সেখানে নিজের রক্তের স্রোতে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল রক্তগোলাপের জাদুকর ফিরদৌসির প্রাণহীন দেহ।

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।